দিবারাত্রি

বিমল কর

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ

দোলযাত্রা, ১৩৬৪

*

প্রকাশক :

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

*

মুদ্রাকর :

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস

১৮৬/১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৪

*

প্রচ্ছদপট :

ব্রজেন্দ্র চৌধুরী

*

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

শ্রীগুরু আর্ট প্রেস

৫০বি, মধু রায় লেন,

কলিকাতা-৬

*

ব্লক প্রস্তুতকারক :

ব্লকম্যান (প্রসেস)

৭৭।৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯

*

দাম তিন টাকা মাত্র

শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
শ্রীমতী শান্তিলতা বসু
শ্রীচরণেষু

ভূগোল

ভূগোলের মাস্টার বিষ্ণুচরণবাবু হাই তুলে হাতের 'আসানসোল হিতৈষী' কাগজটা দুমড়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। আড়াইটে বেজে গেছে। ওআলক্লকের পেণ্ডুলামটা তাঁতের মাকুর মতন সময়কে বুনছে। জানলার ওপর থেকে রোদ পিছিয়ে গেছে খানিকটা, এখন করবী ঝোপের ওপর একটু যেন বসেছে। বাইরে কোথাও একটা কাক ডাকছে।

ইতিহাসের মাস্টার অনাদিবাবু টীচার্স রুমের কাঁঠালকাঠের পা-ভাঙা চিকিস্মুপুরির মতো রঙ-ধরা আলমারির একটা পাল্লা খুলে কি যেন খুঁজছিলেন।

বিষ্ণুচরণ আলমারির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারেন যত রাজ্যের স্পেসিমেন কপির জঞ্জাল, পরীক্ষার ডাঁই-করা পুরনো খাতা, ছেঁড়া ঝাড়ন, কালির বোতল, উই-খাওয়া স্বাস্থ্য-শিক্ষা চার্টের অন্ধকার আর বেয়াড়া ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে অনাদি বৃথাই ভারতের ইতিহাস খুঁজছে।

'কি অত খুঁজছ হে অনাদি, তোমার 'ভারত-সুধা' নাকি ?' বিষ্ণুচরণ বললেন, 'কাজের জিনিস অকাজের জঞ্জালের মধ্যে রাখো কেন ?' বিষ্ণুচরণের কথাগুলো সরল হলেও গলার সুরে ঈষৎ ব্যঙ্গ ছিল যেন।

অনাদিবাবু কোনো জবাব দিলেন না। বিষ্ণুচরণ আধখাওয়া জলটা এবার আর এক-চুমুখে নিঃশেষ করে কাচের গ্লাসটা টেবিলের একপাশে রেখে দিলেন। একটুক্ষণ দেখলেন, বোধহয় গ্লাসের গায়ে আর কতটা ময়লা ধরেছে। তারপর চেয়ারের গায়ে পিঠ আরও

হেলিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ছোট রঙ-চটা, চুন খয়েরের ছোপ-ধরা বার্লির একটা কৌটো বের করলেন। বাড়ির মতন ছোট্ট কয়েকখিলি পান এখনও আছে ওর মধ্যে। গায়ে আঁটা শক্ত একটু চুনও।

'পান খাবে নাকি গো একটা ইতিহাসবাবু?' বিষ্ণুচরণ ডাকলেন। ঠাট্টা করে অনাদিবাবুকে মাঝে মাঝে উনি ইতিহাসবাবু বলেন। কৌটোটা অনাদিবাবুর জন্যে টেবিলের ওপর রেখে নিজে একখিলি মুখে পুরে নিলেন।

অনাদিবাবু ভারত-সুধা খুঁজছিলেন না, খুঁজছিলেন অন্য কিছু। খুঁজে না পেয়ে হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন বিষ্ণুচরণের কাছে। পাশের হাতল-ওঠা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'গোবিন্দকে হাজারবার বলেও আলমারিটা একটু পরিষ্কার করাতে পারলাম না। হারামজাদা পয়লা নম্বরের ফাঁকিবাজ। এবার, বাস্তবিক বলছি বিষ্ণুবাবু, আমি একটা সিরিয়াস স্টেপ নেব।' অনাদিবাবু ধুলোময়লা-ভরা হাতটা কোঁচায় মুছে নিয়ে বিষ্ণুচরণের পানের কৌটো থেকে পান নিলেন।

টেবিলের উলটো দিকে বসে ছিল গৌরাঙ্গ। বাঙলার টীচার। একেবারে ছোকরা। বছর ছাব্বিশ বয়স। লংক্লথের পাঞ্জাবি ওর রোগা লম্বা-গলা চেহারায় মানায় না। তবু পরে। গৌরাঙ্গ বসে বসে চটি মতন একটা বই পড়ছিল।

বিষ্ণুচরণের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। আধফরসা স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথার পাশে চুল পাকতে শুরু করেছে। মুখটা চৌকো। একটু গোঁফ আছে। চোখের দৃষ্টিটা খুব পরিষ্কার। তাকাতে ভালো লাগে।

অনাদিবাবুর রঙ কালো। মুখ একটু লম্বা। মাথার মধ্যিখানে সিঁথি। চোখে চশমা। বছর বিয়াল্লিশ বয়স।

অনাদিবাবু একটু সময় চুপচাপ পান চিবোলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে 'আসানসোল হিতৈষী' কাগজটা তুলে

নিলেন। ফুটখানেক লম্বা একটা লেখার মাথায় টিক মারা ছিল। বিষ্ণুচরণকে আঙুল দিয়ে দেখালেন সেটা। 'দেখেছেন নাকি?'

বিষ্ণুচরণ কোনো জবাব দিলেন না। উলটো দিকের দেওয়ালে ম্যাপ-রাখা র‍্যাকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গোটানো ম্যাপগুলো অসহায়ের মতন পড়ে আছে। লাল রঙের ম্যাপ-পয়েন্টার কটাও ছুঁচলো মুখ তুলে দেখছে যেন কোনটা ভারত, কোনটা আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেনই বা কোনটা—চিনতে পারছে না। চেনা যায় না। সব গুটনো ম্যাপই সমান—সাদা। কারো সাদা পিঠ থেকে ব্যাণ্ডেজের মতন ন্যাকড়াটা কিছু ছিঁড়ে ঝুলছে, কারও কালো কাঠিটা খুলে গেছে একদিকে।

বাইরে কোন গাছ থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল। বিষ্ণু-চবণের কানে গেল ডাকটা। মন্দ লাগল না। কি যেন ভাবছিলেন—কুহু ডাক তাকে ব্যাঘাত করল না। আরও যেন মাধুর্য আর কারুণ্যের রেশ মেলাল।

অন্যমনস্ক ভাবটা কাটল ঘণ্টার শব্দে। ফোর্থ পিরিয়ড শেষ হল। ফিফ্‌থ পিরিয়ডে বিষ্ণুচরণের ক্লাস টেনের ভূগোল। টানা একটি ঘণ্টা। সিক্সথ্ পিরিয়ডটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ হয়। সপ্তাহে মাত্র দুদিন টেনের ভূগোল বলে একঘণ্টার পিরিয়ডটা তিনি নিয়েছেন। ইচ্ছে করেই।

চেয়ারটা একটু ঠেলে পা নামিয়ে বসতে বসতে বিষ্ণুচরণ বললেন, 'তোমরা সবাই শুরু করলে কি? বেচারী গ্রীন সাহেবের কিছুই তো আর রাখো নি; তুচ্ছ একটা পুকুর—তাও তাতে গোরু-মোষ জল খায় আর শালুকফুল ফোটে, তার ওপরও তোমাদের চোখ পড়েছে।' কথাগুলো বেশ জোরে আর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন বিষ্ণুচরণ। হাতের বই ঘণ্টা পড়ার-সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল গৌরাঙ্গ; বিষ্ণুবাবুর কথাটা কানে যেতে তাঁর দিকে তাকাল।

চেয়ার ঠেলে বিষ্ণুচরণও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, কোমরের কাছে কাপড়টা শক্ত করে নিলেন, পা গলিয়ে দিলেন জুতোর মধ্যে। 'আর বাপু, ওই পুকুরের কি কোনো নাম আছে—না গ্রীন সাহেব তাঁর নাম খোদাই করে গেছেন কোথাও। লোকে বলত সাহেব পুকুর। আজও বলে। কি তোমাদের যাচ্ছিল তাতে!'

'যাবে আর কি, একটা কলংক।' অনাদি বললেন। 'যে দেশমাটিতে থাকি তার মন্দির পথঘাট পুকুর—সবেরই একটা মূল্য আছে। ইতিহাস আছে। জাত আছে। গৌরব করার মতন—'

'গৌরব—!' বিষ্ণুচরণ বাধা দিলেন, 'ওই পুকুরের যদি কোনো ইতিহাস বা গৌরব থাকে সেটা গ্রীন সাহেবেরই। পয়সা দিয়ে ওটা তিমি খুঁড়িয়েছিলেন বাউরি পাড়ার জলকষ্ট দূর করার জন্যে। তুমি ইতিহাসবাবু—এ অঞ্চলের কিস্‌সু জানো না, এখানকার মানুষ নও—তবু যে কেন ইতিহাস-ইতিহাস করে চেঁচাও।' অনাদিবাবুকে যেন পড়া-না-পারা ছাত্রের মতন একটা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিতে চাইলেন বিষ্ণুচরণ।

অপমানটা গায়ে লাগল খুব। অনাদি ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'আপনাদের গ্রীন সাহেব বিলেত থেকে ক-জাহাজ টাকা নিয়ে এসেছিল যে এখানে এসে দান-খয়রাত করে গেছে?'

'গ্রীনের নাকি একটা বাউরি-বউ ছিল বুড়ো বয়সেও?' গৌর রঙ্গ করে শুধোল।

'একটা কি কটা তাই দেখ!' অনাদি বক্রহাস্য করলেন, 'মেম, বাঙালী সাঁওতাল, বাউরি—বাদ দিল নাকি কিছু? যত খারাপ পচা করাপশানের কাণ্ড সব করে গেছে বেটা, তখন কেউ কিছু বলতে পারে নি—সেরেফ ভয়ে।'

'তবে আর কি, তুমি ইতিহাসবাবু পিওর, নোবল কাজটাই করো, 'আসানসোল হিতৈষী'তে ছাগলদের জন্যে ওই সব বড় বড়

কথা দিয়ে গজ মেপে মেপে আরটিকেল লেখ। সাহেব পুকুরের নাম বদলে রায়সাহেবের পুকুর হোক।' বিষ্ণুচরণ তাঁর তীক্ষ্ণ মর্মভেদী বিদ্রূপে অনাদিবাবুকে প্রায় পাংশু করে ফেলবার উপক্রম করলেন।

অনাদিবাবু একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'এ সমস্ত অত্যন্ত অন্যায় রকম কথা আপনার বিষ্ণুবাবু। আমি আমার আরটিকেলে কোথাও এ-কথা বলি নি যে, ওটার নাম পালটে রায়সাহেবের পুকুর হোক।'

'সব কথা কি আর বলতে হয় অনাদিবাবু, উহ্য থাকে। সাহেব গেছে কিন্তু রায়সাহেব তো আছে। সালিসি মেনেছ যখন তখন তো বোঝাই যাচ্ছে সব।' বিষ্ণুচরণ কথাটা শেষ করে জানলার কাছে দেওয়াল-ছোঁয়া ছোট টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলেন। ডাস্টার, চক, ছেঁড়া রেজিস্টার খাতা, শুকনো-কালি দোয়াত পড়ে আছে। অভ্যাসবশে ডাস্টার আর চক কুড়িয়ে নিতে গিয়েও হঠাৎ কি খেয়াল হল রেখে দিলেন। অনাদিবাবুর কথা কানে গেল। গৌরবাবুকে চাপা গলায় বলছিলেন অনাদিবাবু, 'স্লেভ মেন্‌টালিটি দেশের মজ্জাকে খেয়ে রেখেছে, তুমি কিছু করতে পার না, পারবে না। একটা পাজী বদমাশ স্বার্থপর বেনে—অন্য দেশ থেকে এসে এখানের জল মাটি বাতাস মানুষ সব কিছুকে দূষিত করে রেখে গেছে—আজও সেই রাস্কেলটার স্মৃতি রাখতে হবে—ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করে।'

বিষ্ণুচরণ কোনো জবাব দিলেন না। ততক্ষণে চৌকাঠের কাছে পৌঁছে গেছেন। কি ভেবে একটু থমকে দাঁড়ালেন। ফিরলেন। ম্যাপ-রাখা র‍্যাকটার কাছে গেলেন, চোখ বুলিয়ে নামের চেন্নাগুলো পড়ে নিলেন। তারপর দুখানা ম্যাপ দু-বগলে পুরে, ম্যাপ-পয়েন্টার নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সেদিকে তাকিয়ে অনাদিবাবু উপেক্ষা আর ঘৃণার একটা স্বগতোক্তি করলেন।

পিরিয়ড শেষ করে টীচাররা সব একে একে আসছিলেন। অনাদি-বাবু ইতিহাসের ক্লাস নিতে বেরিয়ে গেলেন। গৌরাঙ্গ আগেই চলে গিয়েছে।

ক্লাস টেনের ছেলেরা মাছের হাট বসিয়েছিল। বিষ্ণুচরণ ঘরে ঢুকতেই আস্তে আস্তে গোলমালটা থেমে গেল। উত্তরের জানলার একটা পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুচরণ সেটা খুলে দিলেন। জামগাছের খানিকটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। একমুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে, জানলার কাছে দাঁড়িয়েই মুখ ফেরালেন ছাত্রদের দিকে। 'তোমাদের যার যার বাইরে যাবার দরকার আছে—সেরে এস ; আমি তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। ক্লাস শুরু হলে আর কেউ আমাকে জ্বালাতে পারবে না।'

দু-চারটি ছেলে এদিক-ওদিক থেকে উঠে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল। বিষ্ণুচরণের এমন একটা সহজ ব্যক্তিত্ব আছে যে ছেলেরা তাঁর ক্লাসে হাসিখুশি মুখে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ক্লাসটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বিষ্ণুচরণ। বেশ আলো আছে এখনও ঘরে। দেওয়ালে আঁটা মুনিজনবাক্যগুলি এখনও চোখে পড়ে। স্কুলঘরের মাথার ছাদ খাপরার—নিচে সাদা রঙ-করা চটের সিলিঙ। কেমন হলুদ-হলুদ রঙ ধরে গেছে। এই স্কুলবাড়ি কবে তৈরি হয়েছিল ? বিষ্ণুচরণের চোখের সামনে তার টুকরো কটা ছবি ভেসে এল।

ডান দিকে ব্ল্যাকবোর্ড। বাঁ দিকে দেওয়ালে পেরেক গাঁথা আছে। বিষ্ণুচরণ এগিয়ে এসে একটা ম্যাপ তুলে নিলেন। তারপর ডান দিকের দেওয়ালে ঝুলিয়ে ফেললেন।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ।

ছেলেরা অবাক। তাদের এখন ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পড়ানো হচ্ছে। স্যার ভুল করে অন্য ম্যাপ নিয়ে এসেছেন। ক্লাসের মধ্যে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল।

বিষ্ণুচরণ কিছু বললেন না। টেবিলের ওপর আর-একটা গোটানো ম্যাপ পড়ে আছে। সেদিকে তাকালেন। ম্যাপ-পয়েণ্টারটা তুলে নিলেন ডান হাতে। ক্লাসের দিকে চাইলেন এবার। 'নাউ কিপ সাইলেন্স প্লিজ।' বিষ্ণুচরণ চেয়ারের পাশ থেকে সরে ঝোলানো ম্যাপের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। 'আজ আমি তোমাদের জিওগ্রাফির সবচেয়ে বড় লেসন্ দেব। আঠারো বছর ধরে এই স্কুলে আমি জিওগ্রাফি পড়াচ্ছি। আমাকে একেবারে মূর্খ ভেব না তোমরা।'

ভূমিকাটা এমন অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত এবং গুরুগম্ভীর যে গোটা ক্লাসটা হঠাৎ যেন চমকে উঠে বোকার মতন চুপ করে জিওগ্রাফি-স্যারের দিকে চেয়ে থাকল।

'তার আগে তোমাদের একটা গল্প বলব। ভূতের গল্প নয়। মানুষের গল্প।' একটু থেমে ক্লাসের উৎসাহ এবং আগ্রহকে যেন অনুভব করে নিলেন বিষ্ণুচরণ। 'এখন এই ম্যাপটার দিকে তাকাও। তোমরা সকলেই জানো এটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র।' ম্যাপ-পয়েণ্টার ছুঁইয়ে রেখে এবার আরও দু-পা এগিয়ে গেলেন বিষ্ণুচরণ মানচিত্রের দিকে। 'স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ওয়েল্স—ওপাশে আয়ারল্যাণ্ড। এই যে এইটুকু—লাল রঙ্ করা রয়েছে—এটা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের সীমানা। আচ্ছা, এবার—এবার আর তোমরা ওখান থেকে দেখতে পারবে না—তবু তাকিয়ে দেখ—ইংল্যাণ্ডের প্রায় মাঝামাঝি—একটু উত্তরে এই যে জায়গাটা এটা—ডার্বি, ম্যান্সফিল্ড, নটিংহাম অঞ্চল। খুব ভালো কয়লা পাওয়া যায় এখানে, তাই একে বলে কোল্-এরিয়া। অনেক কয়লাখনি আছে। যেমন তোমাদের

এই জায়গাটা—এর আশে পাশে কালিপাহাড়ী, ঘুষিক, এদিকে নিগা—ওদিকে বরাকর—এসবই হচ্ছে কোলফিল্ড। অনেক খনি এখানেও আছে। তেমনি ওই নটিংহাম—নটিংহামশায়ার। এককালে গাধা আর মানুষ মিলেমিশে ওখানের খাদ থেকে কয়লা তুলত। আজ অবশ্য আর সেদিন নেই, হাজার রকম মেশিন কাজ করছে। এখানের ভালো ভালো খাদেও অত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা নেই। গাধা দিয়ে কয়লা তোলার যুগ অবশ্য ওদের অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। বড় বড় পিট্, ডলি, মেশিনঘর এ-সব বহুদিন থেকেই চলছে ওখানে।…যাক সে কথা। এই যে নটিংহামশায়ার – এখানে অনেক দিন আগে তোমাদের বয়সী এক ছেলে থাকত। গরিব কিন্তু বুদ্ধিমান। খানিক লেখাপড়া শিখেছিল। বাপের সঙ্গে কয়লাখনিতে কাজ করত। একেবারে মজুরের কাজ। তবে বুদ্ধিমান বলে, আর খুব ঝোঁক থাকায় সেই ছেলে খাদের অনেক কিছু শিখেছিল হাতে-কলমে। ওভারশিয়ারির একটা সার্টিফিকেটও জোগাড় করেছিল।

'অ্যাশলে গ্রীন তার নাম। গ্রীনের বুড়ো ঠাকুরদা তাকে আদর করে বলত, গ্রীনদের বংশে এ-রকম কালো চোখওয়ালা ছেলে আর কেউ জন্মায় নি। একেবারে কয়লার মতন কালো, তেমনি চকচকে। গ্রীন তার জবাবে বলত, তার রক্তও কয়লার। কয়লার মধ্যে সে জন্মেছে, কয়লাকে সে ভালবাসে।

'ছোকরা গ্রীন সকালে হাতে টিফিন-কেরিয়ার ঝুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে শিস দিতে দিতে উঁচু-নিচু ঢাল পেরিয়ে খাদে যেত—আর রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হত হাসিমুখে সকালের নমস্কার সেরে একটু-আধটু রগড় করে নিত। রগড় সারতে সারতে ওদিকে পিটের মুখে সিটি বাজত—তখন পড়িমড়ি করে ছুটত গ্রীন।…ফিরত বিকেল-শেষে কালিঝুলি মুছে। ফেরার রাস্তাটা—[ফেরার রাস্তাটা গোয়ালা মেয়ে অ্যানির বাড়ির সদর দিয়ে নয়। তবু গ্রীন অ্যানির বাড়ির সদর

ছুঁয়ে আসত। অ্যানি তখন হয়তো গোরুর জাবদায় কাঠের বালতি করে জল ঢালছে। গ্রীন চুপিচুপি তার পিছু এসে দাঁড়াত। সামনের মাঠে ডেইজির পাপড়িগুলো হাওয়ায় ছুলছে, দূরে গীর্জার মাথাটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আকাশে তারা উঠেছে। অ্যানি জেনে-শুনেও চমকে উঠত। হাসত। গ্রীন বলত, সকালে আমার গায়ে তুমি দুধের ফেনা ছিটিয়ে দিয়েছ, অ্যানি; সারাদিন আমি তার গন্ধ পেয়েছি। কী চমৎকার! গ্রীন হাসত, অ্যানিও। অ্যানি বলত, পিটের মধ্যে কয়লার গন্ধ ছাড়াও অন্য গন্ধ তুমি পাও, বিল! তোমার দেখছি বেড়ালের নাক। অ্যানির হাসির লঘু সুরের রেশ ধরে গ্রীন দমকা হাসিতে ফেটে পড়ত; তারপর অ্যানির হাত ধরে ফিসফিস করে বলত······] ফেরার রাস্তাটা—' বিষ্ণুচরণের খেয়াল হল তিনি থেমে রয়েছেন, ছেলেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটুকরো হাসি ঠোঁটের আগায় টপকে এল। বিষ্ণুচরণ শুরু করলেন আবার, 'হ্যাঁ, ফেরার পথটা একটু আঁকাবাঁকা ছিল। গ্রীনের বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে শেষ হয়ে যেত।···এমনি করেই দিন কাটছিল গ্রীনের সুখে-শান্তিতে গরিবীভাবে। এমন সময় গ্রীনের কোলিয়ারির ছোটকর্তা গ্রীনকে বলল, তুমি ইণ্ডিয়ায় যাবে গ্রীন? গ্রেগরি কোল-মাইনস খুলছে। লোক চাই তার; চিঠি লিখেছে আমায়। চলে যাও তুমি; প্রসপেক্ট অঢেল। গ্রীনের কাছে প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। ইণ্ডিয়ার গল্প সে দু-দশটা শুনেছে দাদুর কাছে। গ্রেগরির এজেন্ট থাকে বোল্টনে। খাস অফিস। ছোট কর্তার চিঠি পকেটে পুরে গ্রীন গেল কথাবার্তা বলতে এজেন্ট-অফিসে। সব ঠিক হয়ে গেল রাতারাতি। গ্রেগরির এজেন্ট বলল, তুমি দেখছি একেবারে কাঁচা শক্ত কয়লা। তবে আর কি বাছা, এবার তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাত্রার ব্যবস্থা করো। ক্যালকাটায় গ্রেগরিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

'গ্রীন ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছে—এতে তার বাপ-মার আপত্তি ছিল না। তোমরা যদি এখান থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি মাইল দূরে বর্ধমান শহরে চাকরি করতে যাও—বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে। বাবার ঘুম বন্ধ হবে, মা সারাটা দিন কাঁদবে, পিসি-মাসিরা হায় হায় করবে। ইংরেজ-বাচ্চারা মা-র আঁচল আর বাবার কোঁচা ধরে বসে থাকে না। তারা ঘরকুনো নয়। গ্রীনের ইণ্ডিয়া যাত্রার নামে তাদের সংসারে হুলস্থুল পড়ল না। বুড়ো গ্রীন বলল, ঈশ্বর তোমায় নিরাপদে পৌঁছে দিন। মা বলল, বিল ওখানে চার্চ আছে তো? ঠিক মতন চার্চে যেও। না, না, তুমি একটু নাস্তিক বিল। খুব খারাপ সেটা।...তারপর বাবা-মা ভাই-বোনের অশ্রুজল [চোখের জল সবচেয়ে বুঝি বেশি ফেলেছিল অ্যানি। তার নরম সুন্দর ছেলেমানুষী মুখ যেন সর্বক্ষণ কাঁদছিল—ঠোঁট নীরবে সারাদিন কত কথা বলছিল নিজেকেই। ছোট নদীর মতন রাত্রের অন্ধকারে তার কচি বুক অসহায় স্তব্ধতায় এবং ব্যথায় কনকন করে উঠত। গ্রীন বলত, তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ কেন, অ্যানি; আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে এসে তোমায় বিয়ে করব। তারপর আবার ফিরে যাব। সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে বলত বিল, আর অ্যানির হেলে-পড়া মাথার চুলে নিজের গাল ঠেকিয়ে চার্চের দিকে তাকিয়ে থাকত। ঘাসের গন্ধ গভীর হয়ে উঠত। অ্যানি জানত, মাঠ থেকে, গাছ থেকে, কাঁটা ঝোপ ছেড়ে ম্যাগপিরা উড়ে গেলে অন্ধকার অসহ্য হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙতে চায় না—সমস্ত আশা নিভে যায়। বিল, আমি তোমায় হারালাম চিরকালের মতন। আমি জানি। আমাদের একটা গোরু মরে গেছে—আর একটা গোরু কসাইখানায় বিক্রি হয়ে যাবে আর কিছুদিন পরে, হয়তো আগামী ক্রীস্‌মাসে কুপারের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে।]...হ্যাঁ, তারপর—বাবা-মা ভাই-বোনের শুভেচ্ছা আর অশ্রুজল হাসি সম্বল করে

গ্রীন একদিন নটিংহামশায়ার ছেড়ে, ইংল্যাণ্ড ছেড়ে সাগর পাড়ি দিল।'

বিষ্ণুচরণ আবার একটু থেমে থাকলেন। ক্লাসের দিকে ভালো করে তাকালেন। যোগেশ হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, নৃপেন পেছনের ডেস্কে পিঠ ঠেকিয়ে অপলক চোখে তাঁকে দেখছে, ধীরেন পেনসিল কামড়াচ্ছে। সমস্ত ক্লাসটাই স্তব্ধ। ছুঁচ পড়লেও যেন শব্দ পাওয়া যাবে। ছেলেদের তাহলে ভালো লাগছে? বিষ্ণুচরণবাবু খুশি হলেন। ম্যাপ-পয়েন্টারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে, এবার ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে সরে এলেন।

'আজকের কথা নয়, বাবারা—' বিষ্ণুচরণ গলাটা পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন. 'পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন এঁকছুটে পৃথিবী ঘোরা যেত না। গ্রীনের জাহাজ ভূমধ্যসাগরের হাওয়া খেয়ে—অনেক ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে প্রায় মাস দেড়েক পরে কলকাতায় এসে পৌঁছল। গ্রীন তখন একেবারে ছোকরা, বছর চব্বিশ বয়েস। কলকাতায় গ্রেগরিবা তখন নানা রকম ব্যবসা ফেঁদেছে। ছোট গ্রেগরি আলাদা করে কয়লাখনি করবে। গ্রীনকে তারই দরকার। সে বলল, জমি আমার লিজ নেওয়া আছে—আসানসোলের কাছে—মাইল দশ তফাত। এবার তবে তুমি কাজে নেমে পড়ো।'

বিষ্ণুচরণ টেবিলের ওপর থেকে এবার গোটানো ম্যাপটা তুলে নিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরের গোঁজের সঙ্গে অনেক কারিকুরি করে ম্যাপটা ঝোলাতে হল। একদিকে বেঁকে থাকল। তা থাক।

ছেলেরা এবার অবাক হয়ে দেখল—এই ম্যাপটা বর্ধমান বিভাগের। বিষ্ণুচরণ ম্যাপ-পয়েন্টারের ছুঁচলো মুখ ম্যাপের গায়ে ছুঁইয়ে দিলেন। 'এই যে জায়গাটা—এটা তোমাদের দেশ। ওই আসানসোল—ওর পাশে রানীগঞ্জ—এই একটু নিচে বরাকর-টরাকর—এই দামোদর নদী। পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ-জায়গা কেমন ছিল?

একরকম ফাঁকাই। মাঠ আর কিছু কিছু ধানক্ষেত, পলাশঝোপ। নটিংহামশায়ারের গ্রীন কালিপাহাড়ীর পাশে এই জায়গাটায় প্রথম এসে বোধহয় চমকে উঠেছিল। দূরে ব্যাব্‌কক্‌দের একটা কি দুটো কয়লার খনি চালু হচ্ছে। পুকুরে খাদ। এদিকটা একেবারে জঙ্গলই বলা যায়। সামান্য কিছু ধানক্ষেত বাদ দিলে—থাকার মধ্যে রাশ রাশ পলাশ গাছ, শিশু গাছ, বনতুলসী, কাঁটা-ঝোপ, কাঁঠাল গাছ—আর অজস্র বুনো লতাপাতা। শিয়াল, সাপ আর কাঠবেড়ালি। মুনিয়া নদীর কাছে তাঁবু ফেলল গ্রীন। মাপ-জরিপ-নক্‌শা নিয়ে বসল কার্বাইডের ল্যাম্প জ্বেলে। তারপর কিছুদিন চষে ফেলল আশপাশ।

'প্রথম খাদ খুলল—তোমরা নিশ্চয় দেখেছ স্টেশনের পথ ধরে সোজা গিয়ে ডান দিকে রাস্তাটা যেখানে বেঁকে গেছে—পাথরচটি কোলিয়ারির সেখানে। দিনের পর দিন কতরকম যন্ত্রপাতি আসতে লাগল, বড় বড় প্যাকিং বাক্স, লোহার লম্বা লম্বা থাম, ডায়নামো, পাম্প, মোটা মোটা তার। গ্রামের লোকেরা সব ছুটত দেখতে। আমরাও কতদিন ছুটে ছুটে দেখতে গেছি।

'গ্রীন সাহেব খুব বুদ্ধিমান এবং কাজের লোক ছিল। এখানে আসার পর থেকেই সে ছোট ছোট অসাড় ঘুমন্ত সব গ্রাম, গ্রামের মানুষজন, নদীর দিকে সাঁওতাল পাড়া সর্বত্রই চরকির মতন ঘুরত ঘোড়ায় চড়ে। তার তো শুধু মাটি খুঁড়লেই হবে না, কয়লা কেটে ওপরে তুলতে হবে—তার জন্যে লোক চাই। গ্রীনের প্রথম বন্ধু হয়েছিল মদন পণ্ডখী। শক্ত জোয়ান। একটা পাঁঠা একাই খেয়ে ফেলতে পারত। আর ভাব হয়েছিল গ্রীনের নিতাই চট্টরাজের সঙ্গে। নিতাইবাবু তো আজও বেঁচে আছে, পণ্ডখী মরে গেছে অনেকদিন আগেই।

'পণ্ডখী আর নিতাইকে নিয়ে গ্রীন সাহেব নিজে প্রথম দিন ডুলি

চেপে এককুয়ো নিচের মাটিতে নেমেছিল। সেই মাটির তলায় দাঁড়িয়ে অশিক্ষিত কিন্তু উদার, বেপরোয়া মানুষ পঙখী—আর সামান্য কিছু লেখাপড়া-জানা কিন্তু অত্যন্ত চালাক, বিবেচক নিতাই চট্টরাজের হাত ধরে শপথ করে গ্রীন সাহেব বলেছিল, পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, তোমরা এই সবুজ ঘাসের ওপর বসে দিন কাটাতে পারবে না। এই মাটির তলাতে এখানকার ভাগ্য পোঁতা রয়েছে। আমায় সাহায্য করো। আমি তোমাদের বিশ্বাসভঙ্গ করব না, অন্যায় কিছু করব না।···পঙখী বা চট্টরাজ হয়তো এত সব বোঝেনি। সাহেব তখন পুরো ইংরেজ, ঠোঁটের ডগায় ভাঙা ভাঙা হিন্দি বা বিদিকিশ্রী বাঙলা কিছুই আসে না। কিন্তু সাহেবের আবেগ দেখে চট্টরাজ আর পঙখী মোটামুটি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল।

'সেই থেকে পঙখী আর চট্টরাজ হয়েছিল গ্রীন সাহেবের দু-হাত। দিনের পর দিন গ্রীন পঙখীকে নিয়ে মাটির অন্ধকারে সোনা হাতড়েছে—আর ওপরে নিতাই চট্টরাজ জনমজুরের জন্যে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরেছে—দামোদর নদীর সাঁওতাল পাড়া থেকে মালকাট্টা জোগাড় করেছে। পাথরচটির এক নম্বর খাদ চালু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যেন ওই জায়গাটার চেহারা বদলে অন্য একটা চেহারা হয়ে গেল। পিটের মুখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে লোহার শক্ত থাম, ঘরঘর করে ডুলি নামছে, পাম্প চলছে ফটফট শব্দ করে, ছোট্ট কামারশালায় আগুন আর হাতুড়ি। আমরা তখন বারোচোদ্দ বছরের ছেলে, হেঁটে হেঁটে দেখতে যেতুম কয়লা-খাদ! আর দেখে চোখ কপালে উঠে যেত।

'মনে হয় এ যেন সেদিনের কথা। কি না হল এই ভিজে অন্ধকার বুনো গাছ-গাছড়া ভরা মাটিতে! একনম্বর পিট ভালো করে চলতে শুরু করলেই সোনাল গাঁয়ের দিকে আর একটা খাদ খুলল গ্রীন। হু-হু করে লোক জুটতে লাগল। আশেপাশের গাঁ গ্রামের যাত্রার

দল করা ছোঁড়ারা সব কোলিয়ারিতে গিয়ে ঢুকল। এদিক ওদিক থেকে কত কত বাবুরা এল। সাঁওতালেরা নদী পেরিয়ে এসে এপারে বাসা বাঁধল। পাথরচটির আসে-পাশে ধাওড়া হল। ছোট পাওয়ার হাউস, কয়লার গুঁড়ো ছড়ানো চওড়া সড়ক। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলতে লাগল খাদের কাছে। মালগাড়ির সাইডিঙ। ইঞ্জিন আসত সিটি বাজিয়ে। কয়লা-বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলে যেত।

'গ্রীন সাহেবের বাঙলো তৈরি হল মুনিয়া নদীর ধারে। গ্রীন তখন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার আর এজেন্ট। কারবারে তার অংশ ছিল না একপয়সারও। আমাদের গ্রামের বহু পরিবারের অবস্থা পালটে গেল। আমাদের স্কুল-পাঠশালা ছিল না, জোর্ত-জমি সবায়ের ছিল না, থাকলেও বেশির ভাগের এত কম যে—দুবেলা সারা বছর পেট চলে না, আর কোনোবার আকাল হলে তো গোরুবাছুর ঘটিবাটি বিক্রি করতে হত, না হয় বামুন কায়েতের ছেলে শহরের মিষ্টির দোকানে গিয়ে চাকরি কিংবা কারও বাড়িতে বামুন-চাকরগিরি করা। কোলিয়ারি চালু হবার পর পেটের এই চিন্তা অনেকেরই মিটল। ঘরে টাকা এলে কি মানুষ কষ্টে থাকে। গ্রীন সাহেবের কড়া হুকুম—আশে পাশের গাঁয়ের ছেলে-ছোকরা বুড়ো-হাবা—চাকরি চাইতে এলে চাকরি দিতেই হবে। যেমন হোক, যেখানে হোক। শশী-কানা বলে আমাদের গাঁয়ে এক বোষ্টম থাকত। সে বেটা কাজ পেয়েছিল খাস রাজার। অফিসের বাইরে টুলে বসে দড়ি-টানা পাখার দড়ি টানত। ছমাস চাকরি ছমাস একেবারে ঠায় টুলে বসে থাকা। গ্রীন সাহেব তাকে দেখে রগড় করে বলত, এই শশী, টুমি অন্ধ হও, না চালাক হও। কিয়া হ্যায় আমারি হাতমে বোলো, জলদি বোলো। শশী জানত, গ্রীন সাহেব সব সময় হাতে একটা না একটা কিছু রাখে। বলত, কিছু নেই সাহেব, হাত তোমার ফাঁকা। সাহেব খুব একচোট হেসে

উঠত। ইউ সি চ্যাটার্জী, হি ইজ ভেরি ক্লেভার। হি নোজ এভরিথিঙ। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে কানা-শশীর হাতে দিয়ে গ্রীন সাহেব ঠাট্টা করে বলত, যাও টাড়ি খাও।…ছি ছি, তাড়ি। শশী যে তাড়ি খায় না।··সেই শশী বসন্ত হয়ে মারা গেল। গ্রীন সাহেব তাকে সত্যিই বড ভালোবাসত। শশী মরে গেলে সাহেব বলেছিল, আমার অফিস ঘরে এবার থেকে ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরবে—শশীর হাতেব হাওয়া খেতে আর পাব না।' বিষ্ণুচরণ হঠাৎ থেমে গেলেন! কি যেন ভাবছিলেন। হয়তো কানা-শশীকে। কানা-শশীর একতারা ছিল। একতারা বাজিয়ে সে গান গাইত, কমল মুদিলে আঁখি ভমরের যত তুখ।

বুক ছাপিয়ে ওঠা নিশ্বাস আস্তে আস্তে খালি করলেন বিষ্ণুচরণ। ভাব অনেকটা হালকা হল। ছেলেদের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকালেন। খোলা জানলা দিয়ে উঁচু-নিচু মাঠটা দেখা যাচ্ছে। ড্রিল কবছে একদল ছেলে।

আজ সবই স্বপ্নের মতন মনে হয়—বুঝলে বাবারা!' বিষ্ণুচরণ আবাব তাঁর কথা শুরু কবলেন, 'ভালো করে পর পর আর মনে পড়ে না সব, কোনটা আগে হল, কোনটা পরে। চার নম্বর পিট চালু হল, কোলিয়ারির হাসপাতাল তৈরি হল, ইঞ্জিনিয়াব, ছোট ম্যানেজারদের বাঙলো, বাবুদের কোয়ার্টার, ধাওড়া—। হাট বসল মুসলেব দিকে। কি আমরা ছিলাম আর কি হলাম সেকথা হিসেব করে দেখলে বলতে হয়—আমবা কেউ খেয়ে কেউ আধ-বেলা খেয়ে অশিক্ষায়, রোগে, শোকে আর ঠাকুরপুজো করে ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বেঁচে ছিলাম। কোলিয়ারির সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা অঞ্চলের পাঁচ-সাতটা গ্রাম নতুন ধাক্কা খেয়ে বেঁচে উঠল। একটা সময় গেছে যখন সত্যি আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছি। তখন এখানকার চেহারা আজকের মতন ছিল না।

পাথরচটির যে জীবন আছে সেটা বোঝা যেত। কেটে পড়ত। গ্রামে দুর্গোৎসব, কোলিয়ারিতে কালীপুজো, যাত্রা, বেবি-শো, হাট ভেঙে পড়ত রবিবার দিন। আজ তো মনে হয় সব শ্মশান। কী ছন্নছাড়া চেহারা! সে-সময় দেখেছি তো, সাঁওতালরা যখন সকালে খাদে আসত সে এক দৃশ্য। বিকেলে মাদলের বোল তুলে, টিমি জ্বালিয়ে মেয়েপুরুষ ফিরত, কেউ বাঁশি বাজাত, কেউ বা পথ চলতে চলতেই নাচত, বাবুদের একটা আড্ডা-খানা ছিল, গ্রামের বড়রা সন্ধেবেলায় সবাই দেখ সেই আড্ডায় হাজিরা দিচ্ছে। যাত্রার রিহার্সাল, গান-বাজনা চলত।...একবার গ্রীন সাহেবকে বাবুরা ধরল, এবার কালীপুজোর সময় আর যাত্রা নয়, আমরা থিয়েটার করব। তোমায় একটা পার্ট করতে হবে। গ্রীন বলল, অল রাইট, কিন্তু আমি কিঙ হব না, হি স্পীকস্ মাচ্—মেক্ মি সামথিঙ লাইক দ্যাট গদাধর। গদাধর ছিল ফিটার—সে নির্বাক সৈনিকের পার্ট করত। ...শেষ পর্যন্ত অবশ্য গ্রীন সাহেবের আর পার্ট করা হয় নি। কপালে ছিল না বেচারির। খাদের মধ্যে পড়ে হাত ভেঙে ঠুঁটো হয়ে বসেছিল।

'এখানের প্রাইমারি স্কুল সাহেবের তৈরি। আগে গ্রামের ছেলেদের, আমাকেই ধরো না—দশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবার কাছে শুধু কিছু বাঙলা পড়েছি আর শুভঙ্করী। আমার বাবা তবু রেল স্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন। সাত মাইল পথ ঠেঙিয়ে স্কুল করতে যেতেন। কাজেই ছোট ছোট ছেলেদের কে আর শহরের স্কুলে পাঠাচ্ছে—চোদ্দ মাইল পথ ঠেঙাতে। লাভই বা কি? এগারো বছর বয়সে আমি স্কুলে ভর্তি হই। আমার বাবা গ্রীন সাহেবকে বাঙলা পড়াতেন। সাহেবের মাথায় কে যেন খেয়াল তুলে দিল—সে বলত, স্যান্স্ক্রীট শিখব। বাবা বলেছিলেন, তোমার দ্বারা ও-সব হবে না সাহেব, উচ্চারণ আটকে যাবে—তবে

বাঙলাটা কিছু কিছু বলতে পারবে। বেশ খানিকটা তো রপ্ত করেছ। বাবাকে গ্রীন সাহেব মাস-মাইনে দিতেন, তাছাড়া একটা সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন। সেই সাইকেলের পেছনে চেপে প্রথম আমি স্কুলে যাই।

'এমন মানুষ দু-চার জন থাকে—যারা গায়ের চামড়া, দেশ জাত ধর্ম কিছুই বিচার করে না। তারা যা ভালো তাকে ভালোবাসে, যাতে আনন্দ তাই করে, কেউ তাদের ঠেকাতে পারে না। গ্রীন সাহেব ছিল সেই ধাতের মানুষ। নটিংহামশায়ারের ইংরেজ-বাচ্চা বর্ধমান জেলার এই বনতুলসী, আর পলাশ ঝোপের দেশটাকে হাড়ে হাড়ে ভালোবেসে ফেলেছিল। হয়তো, এটা তার কীর্তির জায়গা বলে, হয়তো এখানে সে অন্য কিছু খুঁজে পেয়েছিল। গ্রীন সাহেব বলত, দিস ইজ মাই হোম।

'খাস ইংরেজবাচ্চা পাথরচটিকে ভালোবাসবে—এ বড় সাংঘাতিক কথা। আশেপাশের কোলিয়ারির আর শহরের কোর্টের রেলের সাহেবরা তাই গ্রীনকে ক্রমশই অপছন্দ করতে শুরু করল। ক্লাবে গেলে ওরা গ্রীনকে কত রকম ভাবে বুঝিয়েছে, নানা ফন্দি দিয়েছে, শেষে ঘেন্না করত। বলত, তুমি সমাজের কলংক ; তোমার বউ···হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি তোমাদের গ্রীন সাহেব বিয়ে করেছিল রেলের কোনো সাহেবের মেয়েকে—(ভিভিয়ান—তার নাম ভিভিয়ান। নটিংহামশায়ারের···গোয়ালার মেয়ে অ্যানির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কুপারের সঙ্গে—সে খবর পেয়েছিল গ্রীন। অ্যানিকে ভুলে গিয়েছিল ও, বিয়ে করেছিল ভিভিয়ানকে। সেই ভিভিয়ান স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারল না। চলে গেল। লোকে বলে অন্য সাহেবের সঙ্গে ঘর করত বলেই চলে গেল, পালিয়ে গেল। মিথ্যে নয়। তবে আসল কথাটা কেউ জানে না। কেউ না। গ্রীনের ছেলেটাকে পর্যন্ত ওর মা যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

সে নাকি গ্রীনের নয়। কে জানে? ভিভিয়ানের রহস্য ভিভিয়ানই শুধু জানে।) কি বলছিলাম যেন, সাহেবের বউ ··হ্যাঁ, সাহেবের বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল। আর কোনোদিন ফিরে এল না।'

বিষ্ণুচরণ জানেন না কখন যে তিনি গল্প বলতে বলতে টেবিলের ওপরই আধবসা হয়ে রয়েছেন। খেয়াল হল এবার। উঠে দাঁড়ালেন। ছেলেরা বেশ তন্ময় হয়ে শুনছে। না শুনবে কেন—! 'এই যে স্কুল—আজ যেখানে বসে তোমরা পড়ছ—এ কার কীর্তি? গ্রীন সাহেবের। সেন সাহেব, নির্মল রায়, ডাক্তারবাবু—এরা সবাই বলল, সাহেব একটা মাইনর স্কুল করা যাক এখানে—আমাদের বাচ্চা-কাচ্চার খুবই অসুবিধে হয়। গ্রীন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কোলিয়ারির পয়সায় বাড়ি হল, এ স্কুলের এই ঘরের ওই দেওয়াল সে-দিন গেঁথে তোলা হয়েছে। গ্রীন নিজে স্কুলের প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছিল। আজ—আজ এর কোথাও গ্রীনের নামটুকু পর্যন্ত নেই। একটা ছবি ছিল তার। সে ছবিও তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কেউ। অবশ্য, হ্যাঁ—সেই মাইনর স্কুল আজ হাইস্কুল, আর কোলিয়ারির মাসিক দুশো টাকা সাহায্য ছাড়া এ আর কিছু পায় না।

'স্কুল শুধু নয়। ওই যে হাটের কাছে একটা ভাঙা একচালা বাড়ি পড়ে আছে দেখেছ তোমরা? ওই বাড়ি কুষ্ঠ-হাসপাতালও হয়েছিল কিছুদিন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে গেলে কতই তো মনে পড়বে।

'যেমন হু হু করে উঠেছিল পাথরচটি—তেমনি বছর বিশের পর পড়তে শুরু করল। গ্রীন সাহেবের দুই হাতই তখন গেছে—পত্নী মরে গেছে, চট্টরাজ রোগে রোগে জীর্ণ—বড় ছেলেটা মরে যাবার পর আর ঘর থেকে বেরোয় না। সেন সাহেবও চলে গেলেন অন্য জায়গায়। বুড়ো ক্যাশবাবু—মণিলাল পালিত সাপের কামড়ে মারা গেল। নতুন যারা এল তারা পাথরচটি কোলিয়ারি গড়ে তোলে

নি—তারা এল হিসেব করে মাস মাইনে গুনে নিতে, চুরিচামারি করে নিজেদের ফাঁপাতে-ফোলাতে।

'গ্রীন সাহেব বোকা ছিল না। সমস্ত বুঝতে পারত। কিন্তু কি যে হয়েছিল তার কাউকে কিছু বলত না। হঠাৎ যেন ছুটন্ত ঘোড়াটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। কোনো কোনোদিন দেখতাম মোটরবাইক নিয়ে নিতাই চট্টরাজের বাড়ি যেত সন্ধ্যেবেলায়। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকত। কেন, কে জানে? ··দুর্ভাগ্য যখন আসে নানারকম জট পাকিয়ে আসে।···পাথরচটির কপালে এবার শনি লাগল! এক নম্বর পিটের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। খাদ ধসে যাচ্ছিল। বয়লার-খালাসী হোসেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল—তাই নিয়ে নানা রকম গোলমাল পাকিয়ে উঠল। চার নম্বরের ম্যানেজার মিত্র সাহেব মারধোর করে আরও ঝঞ্ঝাট পাকাল। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে গ্রীন সাহেবও কতক বেহিসেবী কাণ্ড করে বসল। যার ফলে লাভ হল এই, কলকাতার গ্রেগরি তার ফলন্ত ব্যবসার টাকা নিয়ে ফাটকাবাজি আর জুয়া আর রেসের মাঠে সর্বস্বান্ত হয়ে রাতারাতি লুকিয়ে কোলিয়ারি বিক্রি করে দিল মাড়োয়ারির কাছে।'

বিষ্ণুচরণ থামলেন। ফিফ্‌থ পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল। ঘণ্টা পড়ল। 'ঘণ্টা পড়ে গেল! তাহলে—'বিষ্ণুচরণ হতাশ হয়ে বললেন, 'আজ থাক।'

না স্যার—না স্যার—বলুন স্যার—। সমস্ত ক্লাসটা যেন অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল। হেম বলল, আমাদের লাস্ট পিরিয়ডে ড্রিল, স্যার। ম্যাট্রিক ক্লাসে আর ড্রিল ভালো লাগে না। আপনি বলুন স্যার, ড্রিল-স্যার কিছু বলবেন না। আমি তাঁকে বলে আসছি। হেম হ্যাঁ-না কিছু না শুনেই বেঞ্চি থেকে উঠে ছুটল।

বিষ্ণুচরণের অবশ্য লাস্ট পিরিয়ডে ছুটি। মানে ক্লাস নেই, কিন্তু

অফিসের কিছু কাজকর্ম করার আছে। থাক—কাল কোন সময়ে করে দেবেন।

বাইরে তাকালেন বিষ্ণুচরণ। রোদ আরও পিছিয়ে গেছে। জাম গাছের ছায়া যেন আরও একটু কালো হয়ে ডান দিকের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ক্লাসটা চুপ। অন্য ক্লাস থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে।

হেম হাসিমুখে ফিরে এল। যুদ্ধজয়ের হাসি আর কি!

বিষ্ণুচরণ তাঁর ছেঁড়া সুতোয় আবার গিঁট দিয়ে গল্প শুরু করলেন। 'কোলিয়ারি বিক্রি হয়ে গেল রাতারাতি। গ্রীন জানতে পারল না। যখন জানতে পারল, মানুষটার কী অবস্থা! চব্বিশ বছর বয়সে এসেছিল এখানে, নিজের হাতে একটি একটি করে এই জঙ্গল আর শেয়াল-ডাকা মাঠে প্রায় তিরিশ বছর ধরে একটা রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এক নিশ্বাসে তা যেন ধুলোয় ছত্রাকার হয়ে ভেঙে পড়ল। কোলিয়ারির লোক তার বাঙলো ঘিরে ধরল। জালিয়াত শয়তান ইংরেজ-বাচ্চা—তলেতলে এত কাণ্ড করেছে। কোথায় গেল কোলিয়ারির কাঁচা কয়লার এত পয়সা? কেন এ কোম্পানি বিক্রি হল? গ্রীন সাহেব অকম্পিত। সবার সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ো। আমায় তোমরা মারবে? মারো। আমি তোমাদের পথে বসাই নি, ঈশ্বর শপথ। আমি জোচ্চুরি জালিয়াতি করি নি, বিশ্বাস করো।…ইটপাটকেল ছুঁড়তে লাগল ওরা, গালাগাল দিতে লাগল প্রাণভরে। খবর পেয়ে নিতাই চট্টরাজ তার মরমর শরীর নিয়ে নুনিয়া নদীর বাঙলোয় এসে দাঁড়াল, আর দু-একজন পুরোনো কালের মানুষ। সাহেবকে হয়তো সেদিন ওরা জখম করত, খুনখারাপি হত একটা কিছু; কিন্তু নিতাইবাবু আর অমন দু-একজন মিলে সাহেবকে বাঁচাল।

'কিন্তু সে আর বাঁচা নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও বোধহয়

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ঘর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা। নতুন মালিক ওকে চাকরিতে রাখতে চাইল সুবিধের জন্যে। গ্রীন চাকরি নিল না। নিজের যা টাকাকড়ি ছিল তার কিছুটা খরচ করে বাউড়িপাড়ার দিকে তেঁতুলতলার মাঠে খাপরা-ছাওয়া মাটির এক বাড়ি তৈরি করল। নিতাই চট্টরাজ কতবার বলেছে, সাহেব তুমি চলে যাও—এখানে মাটি কামড়ে থেকে আর কি করবে। হয় কোথাও চাকরি নাও, না হয় নিজের দেশে ফিরে যাও।

'গ্রীন মাথা নাড়ত ধীরে ধীরে। নটিংহামশায়ারের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ কবে কেটে গেছে। কে আছে সেখানে তার? কেউ নেই। সব সম্পর্ক চুকে গেছে। বাড়ি নেই, বাবা-মা মরে গেছে কবে, ভাইরা কোথায় কে জানে, বউ? সে তো আসামে মিসেস গ্রীয়ারসন হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। আই অ্যাম অ্যালোন। নিতাই, আমি একটা ধসে-যাওয়া কয়লার খাদ। ভেতর ফাঁকা, ওপরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া বুনো ঝোপ।

'পাথরচটি ছেড়ে সাহেব কিছুতেই গেল না। ভীষণ মদ খেতে শুরু করল। তাড়ি। আর কিছু হাঁস-মুরগী নিয়ে তার মাটির বাড়িতে বসে বসে পাথরচটিকে দেখতে লাগল। এখানের আকাশ বাতাস মাটি মানুষ গ্রীন সাহেবের বুকের পাঁজরা ছিল। সেগুলো এবার কত রকম ভাবে ভাঙছে।···বছর কেটে যায়—গ্রীন আরও বুড়ো হয়ে পড়ে। শরীর স্বাস্থ্য সব গেছে। ছেঁড়া পা-গুটনো প্যান্ট, পিঠের ওপর দিয়ে গ্যালিসটা ঝুলছে—শার্টের অবস্থা আরও খারাপ, ময়লা তাপ্পিমারা। পায়ে জুতোর বদলে ছেঁড়া কেড্‌স্—তবু দেখ, গ্রীন সাহেব সকালবেলায় কবুতরীর ছেলেকে হাত ধরে···ও, হ্যাঁ—কবুতরী একটা বাউড়ি মেয়ে—সাহেবের কাছে থাকত [লোকে বলত বুড়ো গ্রীন ব্যাটার মাগ। আসলে কবুতরী কি, আর ছেলেটাই বা কার—বিষ্ণুচরণরা তা জানেন। কবুতরীর যৌবনে ওভারশিয়ার

পঞ্চুবাবু তাকে নিজের বাড়িতে রেখেছিল। বিয়ে-থা করে নি পঞ্চু। কারুর পরোয়া করত না। ধর্মাধর্ম মানত না। কবুতরী তার ঝিয়ের কাজ থেকে শুরু করে রান্নাবান্না—মায় মদ ঢেলে দেওয়ার কাজটুকু পর্যন্ত করত। চৈহারাখানা যেমন ছিল পঞ্চুবাবুর, তেমনি কালো আর ভয়ংকর যৌবন ছিল কবুতরীর। সেই কবুতরীর ছেলে যখন হয়-হয়—পঞ্চুবাবু তাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিল—নিজেও অন্য কোলিয়ারিতে পালাল। পেটের বাচ্চা নিয়ে কবুতরী ফ্যাসাদে পড়েছিল। এখান সেখান করে শেষে গ্রীন সাহেবের কাছে এসে পড়ল। গ্রীনের নিজের পেট চলে না, হাঁস-মুরগীগুলো মরে যাচ্ছে, ডিম্ কারা চুরি করে নিয়ে যায়—তবু সাহেব কবুতরীকে আশ্রয় দিল। কবুতরী সাহেবের খাবার তৈরি করে—ভাত ডাল সাবু। তার ভাগ নিজে পায়, ছেলেটাও। কবুতরী বাইরে গিয়ে গতরে খেটে আনে—ঘরে সাহেবের হাঁস-মুরগী দেখে। আর গ্রীন কবুতরীর ছেলেকে নিয়ে খেলা করে।] তার ছেলের হাত ধরে গ্রীন সাহেব সকালে টুক্‌টুক করে হেঁটে বেড়াত কোলিয়ারির রাস্তায়। কারুর সঙ্গে দেখা হলেই দাঁড়াত। আরে ভোলা, কেমন আছ? খাদের খবর কি? জল উঠছে? এই অঘোরী, তোর বাবার অসুখ সেরেছে?…গ্রীনের কথার জবাবটা পর্যন্ত কেউ দাঁড়িয়ে দিত না।

'ধর্মরাজের মেলায় কুঁজো হয়ে ঝুঁকে-পড়া বুড়ো সাহেব কবুতরীর ছেলেকে তেলে-ভাজা কিনে দিয়ে মহানন্দে খাচ্ছে—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি দেখেছি, একসময় ক্যাশিয়ারবাবুর বাড়িতে সত্য-নারায়ণ পুজোর প্রসাদ খেতে যেত সাহেব—তখন তাকে কত আদর-আপ্যায়ন করে কাচের ঝকঝকে প্লেটে প্রসাদ খাওয়ানো হয়েছে। কেউ যদি ঠাট্টা করে বলত, তোমার ধর্ম গেল সাহেব। জবাবে গ্রীন বলত, কলা পেঁপে সিন্নির মধ্যে আমার জেসাস্ বসে নেই।…গ্রীন সাহেবের জেসাস চার্চের মধ্যেও ছিলেন না। সাহেব চার্চেও যেত না।

তবু, সাহেবের চেয়ে বড় ক্রিশ্চিয়ান আমি দেখি নি। সাহেব শেষের জীবনটা শুধু বাইবেল পড়েছে বোধহয়। আমি তখন বি. এ. পাশ করে মাস্টারি করতে ঢুকেছি—সাহেবের কাছে গিয়ে কতদিন বলেছি, তুমি একটু বাইবেল পড়ো, শুনি। সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার মা-র দেওয়া সেই পুরোনো পাতা-হলুদ-হয়ে-যাওয়া বাইবেলটা খুলে পড়ত: Father I have sinned against Heaven, and before Thee, and am no more worthy to be called Thy son : make me as one of Thy hired servants. [গ্রীন সাহেব কি পাপ করেছিল কে জানে? কিন্তু ও ক্রিশ্চান। পাপকে ওরা অস্তিত্বের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। সেই বোধে সাহেবও যেন মরছিল। হয়তো, গ্রীন ভাবতো তার পাপেই সব গেল—সমস্ত—পুরো পাথরচটিটাই—: বিষ্ণুচরণ ভাবলেন মনে মনে।]'

'ভীষণ এক বর্ষা এল সেবার। সাহেবের মাটির ভাঙা বাড়ির মাথার খাপরাও যেন গলে পড়তে লাগল। চারপাশে অজস্র আগাছা জন্মে ঘরটা বন হয়ে গেল। কবুতরী চলে গেছে। সাহেবের অসুখ। কেউ খোঁজ নিল না, কেউ দেখতে গেল না। রাশ রাশ দোপাটি ফুটল। ফণিমনসা জলে জলে সবুজ হল। একফোঁটা ওষুধ না, একটি সান্ত্বনা নয়। হয়তো বাতিও জ্বলে নি কতদিন। শ্রাবণের অঝোর বৃষ্টি, কালো আকাশ, হাওয়ার হাহাকার—তার মধ্যে নটিংহামশায়ারের ছেলে সব ব্যথা যন্ত্রণা নিঃশেষ করে—সব পাপের দেনা শোধ করে চলে গেল।'

বিষ্ণুচরণের গলা ভারি হয়ে এসেছিল। থেমে গেলেন। কিন্তু গলার মধ্যে আরও কি কথা যেন আকুল হয়ে থরথর করছে। না বললেই নয়। 'বলতে পারো তোমরা গ্রীন সাহেব কোথায় গেল?' বিষ্ণুচরণ শুধোলেন।

সমস্ত ক্লাস চুপ। কোথায় আবার গেল? মরে গেল। মারা গেলেন। হেম বলল।

'হ্যাঁ, মারা গেলেন। দুদিন পরে জানা গেল গ্রীন সাহেব মরে গেছে। তার ঘরের চারপাশে গন্ধ। খবর দিলাম—কোনো সাহেব, ক্রিশ্চান, এমনকি আমাদের দিশি ক্রিশ্চানরা পর্যন্ত তার শরীরটা কবর দেবার জন্যে এল না। কেউ না। পাথরচটির সাহেব-বাঙলোর বুড়ো জমাদার তার ছেলেকে নিয়ে গতি করতে এল। উষাগ্রামের রাস্তায় যে কবরখানা আছে—সেখানে গ্রীনের কবর দিতে দিল না। শেষে ভাঙা পাঁচিলের পাশে অ্যাশ্‌লে গ্রীনের কবর দেওয়া হল। নিতাই চট্টরাজের চোখের সামনে। আমিও ছিলুম। আর কালু মেথর, তার ছেলে বদে।' বিষ্ণুচরণ আবার থেমে গেলেন। গলা যেন বুজে আসছে। আর তো বেশি নেই মাত্র কটা কথা।

গলার ঘড়ঘড়ানি পরিষ্কার করে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন বিষ্ণুচরণ, 'যদি তোমরা কখনও উষাগ্রামের দিকে বেড়াতে যাও—আর কবরখানা দেখতে ইচ্ছে করে—তবে সোজা উত্তরের দিকে ভাঙা পাঁচিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িও। দেখবে একটা কাঠচাঁপা গাছের তলায়, কলকে ফুলের ঝোপে আড়াল-পড়া একটি কবর। তার চার পাশে বনতুলসী আর লম্বা লম্বা ঘাস। গ্রীন সাহেব সেখানে চিরকালের মতন ঘুমোচ্ছে। তার কবরের ওপর কাঠচাঁপার ছায়া, দু-চারটি ফুল টুপটাপ করে ঝরে পড়ে—কলকে ফুলের হলুদ পাপড়ি হাওয়ায় দুলেদুলে কবরের গা পরিষ্কার করে দেয়, বনতুলসী আর ঘাস বছরের পর বছর বেড়ে উঠে গ্রীনের কবরকে সবুজ থেকে ঘন সবুজ করে তোলে।

'আমি জানি না, নটিংহামশায়ারে কাঠচাঁপা, কলকে, বনতুলসী আছে কিনা। হয়তো নেই। পাথরচটিতে আছে—পাথরচটির মাটিতে তাদের জন্মজন্মান্তরের বীজ। অ্যাশ্‌লে গ্রীনকে পাথরচটির মানুষ

ভুলে গেছে, মনে রাখবে না— ; সে ইংরেজ। কিন্তু পাথরচটির মাটি, পাথর-চটির মাটির কাঠচাঁপা, কলকে, বনতুলসী—বৃষ্টির জল—গ্রীনকে জায়গা দিয়েছে। মানুষ মানুষের কাছে কত তুচ্ছ গণ্ডির জিনিস। —কিন্তু কই মাটির তো গণ্ডি নেই, জলের তো আপন-পর ভেদ নেই, গাছের তো আমি-তুমি বিচার নেই। ভূগোলের রাজ্যে সীমাও হাতে হাত ধরা। তার চরিত্র আছে—কিন্তু ইতরতা নেই।'

ছুটির ঘণ্টা পড়ছিল। বিকেল নামছে। জামগাছের পাতায় বাতাস যেন আছড়ে পড়েছে। বিষ্ণুচরণ চুপ। তাঁর দুপাশে শত সহস্র মাইল ব্যবধানের দুটি ম্যাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন এই পাগল মানুষটার কথা শুনছিল। এবার হাওয়ায় একটু নড়ে উঠল।

অনেকটা হাঁটতে হয়। কোথায় কাচ-কারখানার কাছাকাছি তেঁতুল ঝোপের কাছে স্কুল, আর কোথায় ময়লাফেলা মাঠের সীমানা ছুঁয়ে ডোমপাড়ার পুকুর। একটা শহরের একেবারে পুবে, অন্যটা পশ্চিমে। রাস্তাটা তাও বা যদি সিধে হত। দেড় মাইলটাক পথ কমত খানিকটা। সিধের বদলে বেঁকেছে, পাক খেয়েছে, ঘুরে ফিরে লতিয়ে লতিয়ে চলেছে। আর যত রাজ্যের ভিড় হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে; মল্লিকবাবুদের মোটর কারখানা, পোস্ট-অফিস, পুলিশ থানা, বাবুপাড়া, বাজারটাজার আশেপাশে রেখে।

নূপুরের তাতে সুখঃ ডুমুরের কষ্ট। নূপুর বলে, "এতটা পথ হাঁটি, খেয়ালই থাকে না।" ডুমুর বলে, "তোর মত আমার লম্বা লম্বা ঠ্যাং নয়ত; আমার পা ধরে যায়।" পাল্টা জবাবে নূপুর মাথা দুলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে উপহাস করে, "পা ধরে যায়—! কী আমার মহারানীর পা রে, এইটুকু রাস্তা যেতে খসে পড়ে। দেখিস, ফোস্কা না পড়ে যেন, কাঁটা না ফোটে! মাসিকে বল না, তোর জন্যে ক্ষিতীশবাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতন ঘোড়ার গাড়ি করে দেবে।"

ঠাট্টাটা, শুধু যদি ডুমুরকে নিয়ে হত, হয়ত মুখ বুঝে সহ্য করে যেত। মাসির নামে গায়ে লাগল ডুমুরের। তেলচিটে, রঙফিকে লাল ফিতেটা চুলের গোছা থেকে খুলতে খুলতে তপ্ত, ঘামভিজে মুখে দিদির দিকে চেয়ে রুক্ষ চোখে বলল ডুমুর, "মাসির বরের ত ঘোড়ার আস্তাবল ছিল না, থাকলে একটা গাড়িরও যোগান থাকত, দেখতিস। তখন তোকে আর বাণী-মানির শাড়ির আঁচলের কাদা ধুয়ে দিয়ে, গোবরলাগা জুতো মুছে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে হত না। তাও ত ওদের পায়ের তলায় ঘাড় পিঠ গুঁজে ঝিয়ের মতন বসতে পাস।"

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই সেদিন বাণী-মানির শাড়ির পায়ের কাছের পাড় আর জুতো ধুয়ে দিয়েছিল নূপুর। স্কুলে টিফিনের ছুটিতে শিপ্রার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। গল্পে এতই তন্ময় যে, জামগাছের তলায় পা হড়কে পড়ল বাণী। গোবরে পা ডুবল। মানির শাড়িতেও ছিটকে গেল। নূপুব তা ধুয়ে দিয়েছে এবং অনেকটা এই উপকারের দাবিতে তাদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে, পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে ওদের বাড়ির ফটক এপর্যন্ত সেছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও ত দু-চারবার বাণী-মানির গাড়িতে চড়েছে নূপুব। কই, তখন ত পায়ের গোবর ধুয়ে দেয়নি, যদিও বসার বেলায় পায়ের তলাতেই বসেছে। আহা, তাতে কী, বসার জায়গা থাকলে কি আর ও না বসত। গদিব একপাশে বাণী, আর একপাশে মানি। তাদের বই-খাতাপত্র, টিফিন-কৌটো, দুধের বোতল। অবশ্য এও ঠিক, গোবর মুছে না দিক, অন্য কিছু ওদের হয়ে না করে দিয়েছে, না দেয়, এমন দিন স্কুলে খুব কমই যায়। তাকে তাই বাণী-মানিরা ভালবাসে। গাড়িতে চড়তে চাইলে চাপায় কখনো কখনো। আর গাড়িতে চড়লে অবশ্য খুবই মজায় কাটে। অত যে নাকউঁচু, ফিটফাট, অল্প কথার বাণীদি-মানিদি—(হ্যাঁ, সাক্ষাতে ওদের তা-ই বলতে হয়; স্কুলের ছোটবড় সব মেয়েকেই দিদি বলতে হয় নূপুব-ডুমুরকে, বয়সে ওরা পনের যোল হওয়া সত্ত্বেও)—সেই বাণীদি মানিদি পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির দরজা অর্ধেকের উপর ভেজিয়ে দিয়ে কী কাণ্ডই না করে। হাসে, গায়ে গায়ে পড়ে, গুনগুন গান গায়, খাতার মধ্যে থেকে চিঠি বের করে নিজেদের মধ্যে ইশারা করে করে পড়ে। এ ওকে চিমটি কাটে, ও তার গায়ে কাগজের বল পাকিয়ে মারে। তার ওপর মজার মজার কথা। এই নূপুর, "তোর ইয়ে হয়?" "কী হয়," নূপুর অবাক আর জিজ্ঞাসু চোখে বাণীদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে; কথাটা বুঝতে পারে না, ধরতেও পারে না। ওর বোবা ক্যালফেলে

মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওরা দুই জ্যাঠতুত-খুড়তুত বোন খিলখিল করে হেসে ওঠে। মানি বলে, 'তোর ঘুম হয় ত রাত্রে?" এবার নূপুর আরও অবাক। এই দুই দিদিই পাগল। রাত্রে আবার ঘুম হয় না কার? জবাবটা তবু একটু লজ্জিত এবং আড়ষ্টের মতন দেয় নূপুর, "খুব হয়; গাঢ়।" জবাব শুনে ওরা দু বোন আবার হেসে ওঠে। বাণী বলে, হাসি থামলে, "যাঃ মিথ্যুক—। তোর আবার খুব আর গাঢ় কি হবে রে—যা ঝেঁটার কাঠির মতন রোগা তুই।" আবার হাসি।

ও-সব কথা থাক, ডুমুরের কথাটা খুব গায়ে লেগেছে নূপুরের। সায়ার দড়ি আলগা করে, শাড়ির সামনের কোঁচটা খুলতে খুলতে নূপুর তার রোগা লম্বা ঘাড় আরও একটু সোজা করে বোনের দিকে লংকাজ্বালা চোখে চেয়ে থাকল একটু। "কী বললি তুই? কী করি আমি? বাণী-মানির আঁচলের গোবর ধুয়ে জুতো পরিষ্কার করে গাড়ি চড়ি?"

"হ্যাঁ, শুধু চড়িস না, ঝিয়ের মতন ওদের পায়ের তলায় কুঁজো হয়ে বসে থাকিস।"

নূপুর অল্পক্ষণের জন্যে চুপ। সারা গা যেন জ্বলে যাচ্ছে। বোনের উপহাস আর বিদ্রূপভরা গোল কালো বিশ্রী মুখটা দেখতে দেখতে খেপে উঠল নূপুর। ভীষণভাবে চেঁচিয়ে উঠল, চিকন গলায়, "বেশ করি বসি ঝিয়ের মতন। ঝিয়ের মেয়ে ঝিয়ের মতন বসব না ত কি ওদের কোলে চড়ে বসব।"

"দিদি!" ডুমুরও চেঁচিয়ে উঠল। ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল নূপুরের কাছে, যেন আর একটা কিছু বললেই এখুনি নূপুরের গা মুখ খিমচে কামড়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে একটা সর্বনেশে কাণ্ড করবে।

নূপুর ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গেলেও একেবারে হার মেনে নিয়ে মুখ বুজে হেঁট মাথায় চলে যাবে, তেমন মেয়ে নয়। কথা সে

বলতই কিছু, আঁচড়া-আঁচড়িও হত খানিক, কিন্তু ততক্ষণে স্নেহশশী এসে গিয়েছে।

স্নেহশশীর গোলগাল চেহারা, হয়ত একটু মাথায় খাটো। রঙ মাছের আঁশের মতন ঘোলাটে ফরসা। মাথার চুল অল্প, মুঠোর মতন, একটা আলগা খোঁপা—থাকলেও চলে, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। উস্কোখুস্কো চুল, মাথা কপাল কানের পাশে ওলটপালট হয়ে আছে। নিকেলের এক মস্ত-হাঁ চশমা। পুরু ঠোঁটে পানের ছোপ। ঘামে মুখ-গাল-গলা ভিজে দরদর করছে। পরনের থানটা গোড়ালিরও এক বিঘত উঁচুতে। গায়ের সেমিজটাও ঘামে ভিজেছে। ডান হাতে পুরনো তালিমারা ছাতা; কালো রঙ উঠে উঠে এখন প্রায় খয়েরী। কাঁধের পাশে পাড়-সেলাই থলি ঝুলছে এক। পায়ে মোটরের টায়ারের চটি, ঘরের বাইরে খুলে এসেছে।

ছাতা রেখে, কাঁধের থলি খুলতে খুলতে হাঁপধরা স্নেহশশী থানের আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। "কী হল, আবার দুটোতে খেয়োখেয়ি করছিস? ফিরেছিস কখন—? আগুন দিয়েছিস উনুনে?'

শেষ প্রশ্নটা নূপুরকে। এবেলা নূপুরের উনুন ধরাবার কথা; ওবেলা ডুমুরের।

নূপুর চলে যেত অন্য সময় হলে; এখন কিন্তু গেল না। তার ভয়, ওর অসাক্ষাতে ডুমুর যদি কথাটা বলে দেয়; গাড়ি চড়ার কথা নয়, ঝিয়ের মেয়ের কথাটা।

ডুমুর বুদ্ধিমতী। কী বলতে হয় না-হয়, সে জানে। ঝগড়া-ঝাটির কথা না তুলে অন্য কথা তুলল ডুমুর। "আর পারি না; গরমের ছুটি ঠিক কবে থেকে হবে বল ত মাসি?"

"এই ত আর ক'দিন পরেই।" স্নেহশশী ভাঙা হাত-পাখাটা টেনে নিয়ে মেঝেয় থপ্ করে বসে পড়ল। "তোদের এত পারি না পারি না কেন রে? মর্নিং স্কুল—সকালবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়

যাস, ফেরত বেলাতেই যা রোদ। তা আমার সঙ্গে এলেই পারিস, ছাতার তলায় আসবি। তাও ত আসিস না।"

না, তা ওরা আসে না। নূপুর ত নয়ই, ডুমুরও নয়। মাসির সঙ্গে আসা মানে ছুটির পরও খানিকক্ষণ স্কুলে আটকে থাকা। তার পর পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আরও এক ঘণ্টা দেরি করে তবে বাড়ি আসা। হ্যাঁ, তাদের মাসি, স্নেহশশী স্কুলের ঝি—গরুর পালের মত মেয়ে জুটিয়ে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, আবার বাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়ে যাওয়া তার কাজ।

মঙ্গলময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে স্নেহশশী বছরের পর বছর ধরে এই কাজ করছে।

'"এবার নাকি এক মাসেরও বেশী ছুটি মাসি?" ডুমুর স্নেহশশীর হাত থেকে পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

"এক মাস ছ'দিন।" স্নেহশশী এমনভাবে বলল যেন এ-সব গুরুতর কথা একমাত্র বড়দিদিমণি আর সে জানে। অন্য কেউ নয়।

নূপুর এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছিল উনুন ধরাতে।

"এই নূপুর—" স্নেহশশী বলল, "তুই আজ ইংরিজী পড়া পারিস নি; ভূগোলে দ্রাঘিমার অঙ্কও করতে পারিস নি। কমলাদিরা আমায় বলেছে। কেন পারিসনি?"

নূপুর জানে, কমলাদি কি উমাদিরা কেউ সেধে মাসিকে এ-সব কথা বলতে যায় না। মাসিই শুধোয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। মাসির এটা অভ্যেস। বোনঝিদের পড়াশোনার উপর চোখ রাখে।

"পেরেছিলাম। একটু ভুল হয়েছিল।" নূপুর বলল। বলে আর দাঁড়াল না; তাড়াতাড়ি উনুন ধরাতে গেল।

এবার ডুমুরের পালা। গা থেকে শেমিজ খুলে কোমরে নামিয়ে দিয়ে স্নেহশশী বলল, "আর তুই কী করেছিস রে ডুমুর, টিফিন-ঘরের গ্লাসে করে জল খেয়েছিস?"

"খেয়েছি।"

"কেন, তোদের না বারণ করে দিয়েছি। হাতে করে খেতে পারিস না? আমি ত খাই।"

"আমার ডান হাতটা দেখ না—"ডুমুর হাত বাড়িয়ে দিল। তরকারি নামাতে গিয়ে হাত পুড়েছিল কাল। ফোস্কাটা আলু-ভাজার মতন রঙ ধরে গেছে। "এই হাতে করে কি জল খাওয়া যায়?"

"তবে মেজে ধুয়ে রেখে দিলি না, কেন?" স্নেহশশীর গলায় খুব চাপা এক বিষণ্ণতা।

ডুমুর চুপ। স্নেহশশীও। অনেকক্ষণ পরে স্নেহশশী বলল, "দিদিমণিদের মুখের জিনিস আমাদের মুখে ছোঁয়াতে নেই।"

ছোঁয়াতে নেই ডুমুর তা জানে। "তোমায় বুঝি কেউ লাগিয়েছে?" শুধলো ডুমুর, এবং ভাববার চেষ্টা করল, ওর জল খাওয়ার সময় টিফিনঘর ত ফাঁকা ছিল, কে তবে দেখল! গ্লাসটা রেখে দেবার পর অবশ্য হাসি ঢুকেছিল। তবে কি সে আড়াল থেকে সব দেখেছিল?

ডুমুরের কথার কোন জবাব দিল না স্নেহশশী। গায়ের ঘাম অনেকটা মরেছে। অতটা রাস্তা হেঁটে আসার ক্লান্তি-ভাবটাও খানিক কেটেছে মনে হল। মাথা চুলকে, হাই তুলে স্নেহশশী এবার উঠি উঠি করছে। বাইরে ততক্ষণে কাঠকুটো দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিয়েছে নূপুর, খোলা দরজা দিয়ে গলগলে ধোঁয়ার খানিকটা ঘরে ঢুকছিল।

ডুমুর আজ বেশ একটু চটেছে, হয়ত তার গায়েও লেগেছে কিছু। মাসি জবাব দিচ্ছে না দেখে, অধৈর্য হয়ে বলল, "কে তোমায় লাগিয়েছে বললে না?"

"যেই বলুক, তোর তাতে কী! যা অন্যায় তা তুই করবি কেন?" স্নেহশশী এবার সামান্য ধমকের গলায় বলল।

এর পর সরাসরি না হলেও মাসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গজগজ করতে লাগল ডুমুর "ডোমপাড়ার কাছে থাকি বলে আমরা কি ডোম মুচি মেথর নাকি যে, যার যা খুশি বলবে। নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠেছে সব। রত্তি রত্তি মেয়ে, তাদের আবার ফুটুনি দেখ। গ্লাসে জল খেলে জাত যাচ্ছে সব।" ডুমুর দড়ির ওপর টাঙান গামছাটা টান মেরে টেনে নিল, মাসির পাড়ের থলিটা পেরেক থেকে খুলে তাল পাকিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। "সিক্স ক্লাসের এক ফোঁটা মেয়ে সুরমা, তাকেও দিদি বলি নি বলে চুকলি খেয়েছে কাল ফরসা দিদিমণির কাছে। অমন মেয়ের গলা টিপে দিতে হয়, বদমাস শয়তান কোথাকার!"

"আমি যদি ছোট বড় সবাইকে দিদিমণি বলতে পারি, তোরাই বা না পারবি কেন? বললে কি মুখ ক্ষয়ে যায় তোদের?" স্নেহশশী এবার সত্যিই রেগেছে।

"মুখ ক্ষইবে কেন, মাথা হেঁট করে থাকতে হয়।" ডুমুরের স্পষ্ট জবাব। "অতয় আমার কাজ নেই। আমি পারব না। আমি আর স্কুলে যাব না কাল থেকে। তোমায় বলে রাখলাম তা।" ডুমুরের গলা ভারী হয়ে এসেছিল। হয়ত চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। পাড়-সেলাই এক-রঙা ময়লা শাড়িটা হাতে করে স্নান করতে চলে গেল ডুমুর, পুকুরে।

স্নেহশশী এই গোঁ-ধরা, বেয়াড়া মেয়েটার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় একটু মন দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। উনুন ধরল এতক্ষণে। রান্না হতে, স্নান করতে খেতে দুপুর। তারপর আর কতটুকু জিরোন। বিকেল হতে না হতেই বেরুতে হবে। তিন বাড়ির কাজ। এক বাড়িতে সেলাই শেখান, এক বাড়িতে একটি অন্ধ বাচ্চাকে কিছুক্ষণ সামলান, তারপর বড়দিদিমণির বাড়ি গিয়ে তার রান্নাটুকু করে দিয়ে আসা। বড়দিদিমণি অবশ্য একা লোক; ঝঞ্ঝাট নেই তেমন।

এত যে গা-গতর দেওয়া, এ-সব কার জন্যে? স্নেহশশী মনে মনে নূপুর-ডুমুরকে বলল, তোঁদের জন্যেই ত। তোরা যদি না পড়বি, না ভাল ভদ্র হবি, ত আমার এই বয়সে এত কষ্টর দরকারটা কী?

নূপুর-ডুমুরের দায়-দায়িত্ব ভাবনা না থাকলে স্নেহশশীর বাস্তবিক কোন ঝক্কি ছিল না। একলা মানুষ। ডোমপাড়ার কাছে খাপরার-চাল-দেওয়া মাটির বাড়িটা তার। একখানা বড় ঘর, আর একটা ছোট। একটু বারান্দা, এক ফালি রান্নাঘর, বাড়ির বাইরে ক' হাত জমি, বাগান মতন। তাতে পুঁই-লাউ-কুমড়োর মাচা, দু-চারটে বেগুন আর লঙ্কা গাছ, তুলসী চারা, দোপাটি ফুলের ঝোপ, বেলফুলও আছে দু-একটা। যতটুকু জায়গা তার চেয়ে বেশী গাছ। বাগান ত নয়, ঝোপের মতন দেখায়। তা দেখাক। কী আসে যায় তাতে! মানুষটা বেঁচে থাকতে থাকতে মাথা গোঁজার জন্যে এটুক করেছিল তাই না রক্ষে। নয়ত বাজারের এঁদো অন্ধকার নোওরা ঘিনঘিন পায়রাখোপ ঘরে থাকতে হত স্নেহশশীকে। তাও ভাড়া গুনে।

মানুষটা বুদ্ধিমান ছিল। ভবিষ্যৎ বুঝতে পারত। হাতে কিছু টাকা এল যখন, হঠাৎ উড়িয়ে ফুরিয়ে দিল না, ডোমপাড়ার কাছে এই সস্তা জমিটুকু ধরে কয়ে আরও একটু সস্তা করে কিনে নিল। সোয়া কাঠা জমি—বোধ হয় টাকা চল্লিশ পড়েছিল। তারপর একটু একটু করে এই বাড়ি। মজুর দু-চারজন যা না খেটেছে, তার চেয়ে বেশী খেটেছে মানুষটা নিজে। কাদার গাঁথনি করার সময় স্নেহশশীকে পর্যন্ত বাদ দেয়নি। খাপরাগুলো নিজেই বসিয়েছে একরকম। খুব কাজের লোক ছিল মানুষটা। আর বুদ্ধিমান।

মল্লিকবাবুদের মোটর-কারখানায় কাজ করত। তখন ও-কারখানা কত ছোট ছিল, শহরের এই দিকটাও এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ে ওঠেনি।

স্নেহশশী তখন বউ মানুষ। অবশ্য এমন নয় যে, গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বাড়ির মধ্যে সারাদিন সে বউ সেজে বসে থাকত। স্নেহশশী তা পারত না। আলাপী স্বভাব, কথা বলতে না পারলে পেট ফুলে মরত। একটু ঘোরাফেরার অভ্যাস ছিল। মানুষটা যতক্ষণ বাড়ি থাকত, ততক্ষণ স্নেহশশী কোথাও বেরুত না। কিন্তু মোটর-কারখানার কাজ, সময়ের ঠিক ছিল না; কাজ পড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। তখন স্নেহশশীর বড় কষ্ট হত। এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে বেড়াত। বউ-ঝিদের সঙ্গে গল্প করত, একে তাকে সেলাই শেখাত। সেলাইয়ের হাতটা বরাবরই ভাল ছিল তার। এক ভাঙা ঝরঝরে সেলাই-কল কিনে সেটা সুন্দর করে মেরামত করে দিয়েছিল সেই মানুষটা। স্নেহশশী তাতে রাজ্যের বড়-ঝি-বাচ্চা-কাচ্চার জামা ফ্রক ইজের সেলাই করে দিয়েছে। কলটা এখন আর নেই। গত বছর পূজোর আগে আগে খুব বর্ষায় বাড়িটার মাথার উপরকার পুরনো খাপরাগুলো একেবারে ফাঁক-ফুটো হয়ে গেল। জল আর আটকায় না। তখন কলটা বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় নতুন খাপরা কিনে মাথা বাঁচাতে হল। স্নেহশশীর খুব কষ্ট হয়েছিল কল বিক্রি করতে। কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। ধার কর্জ করতে ভরসা হয় নি; আগে থাকতেই একটা ধার মাথার উপর চেপে বসেছিল—নূপুরের অসুখের সময় থেকে—তার দেনা পুরো শোধ হয়নি তখনও—আবার ধার করে সে-বোঝা বাড়ান!

স্নেহশশী একলা মানুষ হলে এত তার ঝক্কি ঝামেলা ছিল না। সে-মানুষটা মাথা গোঁজার জায়গা করে দিয়ে গিয়েছিল—একটা পেট চালাবার জন্যে মঙ্গলময়ী স্কুলের ঝিয়ের চাকরিটাই যথেষ্ট ছিল।

উনচল্লিশ টাকা সাত আনা মাইনে; তার কুলিয়ে ত যেতই, উপরন্তু দু-পাঁচটা টাকা হাতে হয়ত থাকত।

এখন আর কুলোয় না। তিনটে পেট; দু-বেলা ভরানো চাই। তার উপর টুকটাক আছেই। খেতে যেমন পয়সা লাগে, পরতেও তেমন দরকার। এ-মেয়ের শাড়ি আসে ত ও-মেয়ের জামা। নূপুরের জন্য একটু দুধ বরাদ্দ আছে। বড় কাহিল মেয়েটা। একপো দুধ নেওয়া হয়—চা-টা খেয়ে যেটুকু থাকে নূপুর খায়। ওর একটু খাওয়া দরকার। এবার নাইট ক্লাসে পড়ছে। মাথার খাটুনি আছে। এখন থেকে শরীরে কিছু না জমলে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটার পড়ার খাটুনি খাটতে পারবে কেন? ডুমুরটা অত পলকা নয়, তার দুধ লাগে না। কিন্তু ওই মেয়েটার অন্য রকম গোঁ। চেয়েচিন্তে পুরনো বই এনে দিলে সে পড়বে না; মেয়েদের পরীক্ষার পুরনো খাতা থেকে কাগজ এনে দিলে সে তাতে লিখবে না। তার জন্যে কিনে-আনা বই চাই, খাতা চাই। আর নিত্যই ও-মেয়ে শাসাচ্ছে, স্কুলে আর যাব না। অনেকটা পথ—আমার পা ব্যথা করে।

স্নেহশশী জানে, পা ব্যথা নয়—অন্য ব্যথা। মনে যা বড় লাগে, বুকেও। ডুমুর সবার সঙ্গে মানে এক হতে চায়—ইরা মীরা হাসি কল্পনার সমান সমান। কারুর কাছে হেঁট হতে রাজী নয়।

ঠিক ওর মেসোর স্বভাব। সে-মানুষটাও এমনি ছিল। স্নেহশশীকে কোন অবস্থা থেকে কী ভাবে এনেছিল সে-কথা ভাবলে আজও বুক শুকিয়ে আসে। ভদ্র, কিন্তু বড় গরিব ঘরের মেয়ে ছিল স্নেহশশী। উড়ো এক মাঝবয়সী বর জুটেছিল কপালে। হুট করে কোথা থেকে এল—আগ বাড়িয়ে আধপাগলা দাদাটাকে ধরল। বিয়ের পর বাড়ি যাচ্ছি বলে স্নেহশশীকে নিয়ে গিয়ে উঠল কোথাকার এক ধরমশালায়। অষ্টমঙ্গলায় বাপের বাড়িতে ধুলো-পা করবার

নাম করে এনে রেখে দিয়ে পালাল। তার আগেই গায়ের সামান্য যা গয়না-গাঁটি তাও ফন্দি করে বাগিয়ে নিয়েছে।

স্নেহশশী ঘেন্নায় লজ্জায় ব্যথায় প্রথম প্রথম কিছু ভাঙেনি। ভেবেছিল, বিয়ে যখন করেছে সাত পাক দিয়ে নারায়ণ সাক্ষী করে—তখন আজ হক, কাল হক, ফিরবে।

কিন্তু সেই জালিয়াত জোচ্চোরটা ফিরল না। চাপা কথাও আর চাপা থাকল না, স্নেহশশীর মুখ থেকে ধীরে ধীরে বাড়ির আর পাঁচজন জানতে পারল। তারপর বছরের পর বছর সেই কষ্টের সংসারে মরমে মরে, মান খুইয়ে, বিছের কামড়ের মতন জ্বালা সয়ে সয়ে কাটছিল। এমন সময় ওই মানুষটার সঙ্গে কেমন করে যেন ভাব হল। জাতে ছোট, মনে বড়। প্রায় পঁচিশ বছর বয়সে, সব যখন মরে গিয়েছে, আশা সুখ স্বপ্ন কিছু আর নেই, তখন যে কী হল স্নেহশশীর, কিছুতেই মন বাঁধ মানল না। ভালবাসল লোকটাকে। তারপর এক মাঝরাতে বাড়ি ছেড়ে উধাও।

ওদের বিয়ে হয়নি ; না সাতপাক, না নারায়ণ, না ঠাকুর-দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য একটা প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত। তবু ওই মানুষটার নামে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে স্নেহশশীর মন ভরে গেল। বিয়ে না করেও ওরা স্বামী-স্ত্রী। এক সংসার, এক সুখ, একই দুঃখ, একই বিছানা—সে সুখেই হক কি শোকেই হক।

এ-শহর ও-শহর ঘুরে ঘুরে শেষে এই শহরে। এখানে বছর ছয় বেঁচে ছিল মানুষটা। তার পর চলে গেল চিরকালের মতন। যাবার আগে যেন বুঝতে পেরেছিল। ডোমপাড়ার বাড়িটা তাই তৈরি করে দিয়ে গেল মাথা গোঁজার জন্যে।

বাস্তবিকই লোকটা মান বুঝত। ভালবাসা বুঝত। কর্তব্য বুঝত। মল্লিকবাবুদের কারখানায় গোলমাল হল, কথা কাটাকাটি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন বাজারে আলুর দোকান দিল ; পোষাল

না বলে কাপড় ফিরি; তাতেও যখন সুবিধে হল না—বাজারে মাংসর দোকান দিল।

স্নেহশশীর সেটা ভাল লাগেনি। শেষ পর্যন্ত কসাইগিরি! ছি ছি, ওটা ভদ্রলোকের কাজ নয়।

"আমি ভদ্রলোক নই," মানুষটা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল। "ভদ্রলোকদের পায়ের জল চাটতে আমি যাব না। আমি ছোটলোক। লেখাপড়া জানি না; ব্যাঙের পাতা পর্যন্ত বিদ্যে। হাত নেড়ে খাই। মাংসর দোকানে পয়সা আছে। আমি করব।"

নূপুর আর ডুমুর তখন সবে ঘাড়ে এসে পড়েছে। স্নেহশশীর দিদির মেয়ে। বাপ গিয়েছে অনেক দিন। মাটা যাব-যাব করছিল। ছোট বোনকে অনেকদিন যাবৎ চিঠিপত্তরের মধ্যে দিয়ে ধরেছিল। শেষে একরকম পায়ে ধরল মর-মর সময়ে। ওই মানুষটাই রেলভাড়া খরচ করে বর্ধমানে গিয়ে মেয়ে দুটোকে নিয়ে এল।

মানুষটা মরার আগেও বলেছে, "সব বিক্রি করবে—ঘটিবাটি মায় বাড়ি পর্যন্ত; কিন্তু খবরদার, মান নয়; আর—" আর যা তার কথা ওঠে না।

স্নেহশশী মান বিক্রি করেনি। করে না। যা বিক্রি করে তা শ্রম। হয়ত সব শ্রমের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই। স্নেহশশী স্কুলের ঝি। তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না তাই। তাতে কী, ভালবাসে ত; তাতেই স্নেহশশী খুশী। নূপুর-ডুমুর তাদের মাসির এই খুশিটুকু বুঝুক, স্নেহশশী আর কিছু চায় না।

গরমের ছুটি হল।

খুব গরম পড়েছে এবার। কোন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ তেতে ওঠে, বেলা বাড়ার তর সয় না—কটকটে রোদ আর রোদের ঝাঁঝে চোখ জ্বলে যায়; সামনের ডোমপাড়ার ফাঁকা মাঠটা

উনুনের আঁচের আভার মতন গনগন করতে থাকে। খানিক বেলা হল ত কার সাধ্যি ঘরের বাইরে আসে, যেমন গরম বাতাস তেমনি চড়া কাঠফাটা রোদ। গাছলতাপাতা যেন পুড়ে পুড়ে শুকিয়ে হলুদ রঙ ধরেছে, মাঠের ঘাসও। কার পোষা এক তিতির আসত আগে, স্নেহশশীদের বাড়ির কাছে আতা গাছে বসত। এত রোদে সেও আর আসে না। কানা কাকটা শুধু কুমড়ো-মাচার উপর বসে মাঝে মাঝে ডাকে।

স্নেহশশীর হয়েছে মুশকিল। সারাটা দিন ঘরে বসে বসেই কাটাতে হয়। বিকেলেও এক বাড়ির কাজ কমে গিয়েছে। বড়দিদি-মণি ছুটিতে বাড়ি গিয়েছেন। অন্য দুই বাড়ির একটাতে, যেটাতে সেলাই শেখাত স্নেহশশী, তাদের ওখানে রোজ যাওয়ার কথা নয়—তবু যেত ও; এখন আর তাও যাওয়া যায় না—সেই মাধুরী বৌমণির বাচ্চা হবে, রোজই শরীর খারাপ যাচ্ছে। বিছানা আর ছাড়ে না। ও-কাজটা হয়ত গেল।

নূপুরেরও ভাল লাগে না। স্কুল বন্ধ ত সব বন্ধ। দুটো মনের মতন কথা বলবে এমন সঙ্গী নেই। লতিকার চশমা আসার কথা ছিল কলকাতা থেকে, এসেছে কিনা কে জানে! কেমন দেখাচ্ছে ওকে চশমা পরে—? দীপালির বিয়ের কথা উঠেছিল, এই জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়েই হয়ে যেতে পারে। দীপালি পাটিগণিত বইয়ের মধ্যে করে তার হবুবরের ছোট্ট এক ছবি এনেছিল। ওরা ক্লাসের সব মেয়ে দেখেছে। নূপুরকে বাদ দিয়েছিল প্রথমে। তারপর দীপালির পায়ে ধরে সেধে শেষে ছবিটা দেখেছে নূপুর। বেশ চেহারা, দীপালির বরের। চুল ওলটান, লম্বা নাক, হাসি-হাসি মুখ। বান্ধব-আলয়ের সেই ছেলেটার মতন। ও-ছেলেটাও বেশ ভাল। নাম মাধব। দোকানের কাচের আলমারির পাশে টুলের উপর বসে থাকে, নস্যি নেয়, গল্পের বই পড়ে, আর মাঝে মাঝে হেলান দিয়ে পা

তুলে বাঁশের আড়বাঁশি বাজায়। ওর দোকানে স্কুলের মেয়েরা খাতাপত্র, পেন্সিল, লজেন্স, চানাচুর, ফিতে-টিতেও কিনতে যায়। নূপুরও অন্য মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতদিন গেছে। নিজে একলা খুব কমই। মাধবদা এমন দুষ্টু, নূপুরকে দোকানে দেখে একদিন কোথা থেকে পায়ে-বাঁধা ঘুঙুর বের করে দিয়েছিল একজোড়া। ঠুনঠুন ঝুনঝুন করে কী সুন্দর শব্দ হয়েছিল, যখন হাতে করে নাড়ল ও। "নেবে নাকি, নাও না—খুব সস্তা দাম।" ছেলেটা মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছিল, "আরও সস্তায় দিয়ে দেব।" আহা, নূপুর কি নাচতে জানে নাকি যে পায়ে ঘুঙুর বাঁধবে। লজ্জায় আর চোখ তুলতে পারে নি নূপুর। তারপর মাথা নেড়ে বলেছিল, "পয়সা নেই।"...... আর একবার মাধবদা ওকে গল্পের বই পড়তে দিতে চেয়েছিল। নূপুর তাও নিতে পারেনি। সর্বনাশ! ডুমুরটা আছে না। তার চোখ বাঁচাবে কী করে নূপুর।......মাধবদাকে আর দেখতে পাচ্ছে না নূপুর; পাবেও না স্কুল খোলা পর্যন্ত। এ-ছাড়া আরও কত কী! পাল কোম্পানির দোকানে নতুন রকমের শাড়ি এলে দোকানের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে। মেয়েরা যেতে যেতে দেখে। চায়ের দোকানের কাছে শহরে যে সিনেমা এসেছে তার রঙচঙে ছবি। কী সুন্দর! কোন্ মান্ধাতার আমলে নূপুররা একবার মাসির সঙ্গে "সাবিত্রী" দেখতে গিয়েছিল, তার পর ব্যাস্ আর কোন সিনেমাই দেখে নি। বাণী-মানিরা সব বই দেখে—যত বই আসে। তারা সবাইকে চেনে, যারা সিনেমা করে। চায়ের দোকানের কাছে টাঙানো রঙচঙে ছবিগুলো দেখে দেখে নূপুরও অনেকের মুখ চিনে গিয়েছে। বলা যায় না, এই এক মাসেরও বেশী না দেখে দেখে আবার মুখগুলো সব ভুলে না যায়।

বিশ্রী লাগে নূপুরের। খালি সংসারের কাজ কর আর বই মুখে করে বস। ডোমপুকুরের জল শুকিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে, ও-জলে

আর স্নান পর্যন্ত করা যায় না। খানিক দূরের শিব-মন্দিরের কুয়ো থেকে আগে শুধু খাবার জন্যে এক ঘড়া জল আসত, এখন ঘড়া ঘড়া জল বয়ে আনতে হয়। ডুমুরটা এত পাজী যে, কখনও ঘড়া কাঁকালে করবে না; জল আনতে বললে বালতি হাতে ঝুলিয়ে যাবে। নূপুরের ত ওই সরু লাউয়ের মত একটু কোমর। ঘড়ায় জল বইতে ওর যে কী কষ্ট হয়। কে তা দেখছে।

আরামে আর স্বস্তিতে আছে ডুমুর। স্কুল বন্ধ ত নয়, যেন জায়গা বদল; এক শহর থেকে আর এক শহরে চলে আসা। কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ চোখ চিরে দেখছে না, ঠোঁট বেঁকাচ্ছে না, চুকলি কাটছে না। স্কুলের সেই বদমাস পাজী হতচ্ছাড়া মেয়েগুলোকে যে দেখতে হচ্ছে না, তাদের কিচির মিচির শুনতে হচ্ছে না, এতে ডুমুর বেঁচেছে। বাঁচা শুধু নয়, খুব স্বস্তি আর সুখে আছে। মন একেবারে ঝরঝরে। এ-বেলা ও-বেলা বই নিয়ে খানিক বসছে, বাকীটা সময় টুকটাক কাজ আর কথা নিয়ে দিব্যি আছে। আজ ঝুল-পড়া রান্নাঘর পরিষ্কার করছে, কাল সোডার জল দিয়ে কৌটোবাটা মায় এঁটো ন্যাতা মরচে-ধরা কড়াই ধুচ্ছে। বড় ঘরটার সব কিছু তিল তিল করে পরিষ্কার করল। তারপর পড়ল বাগান নিয়ে। পাঁচ হাতের সেই ঝোপের পিছনে গোটা একটা দিন কাটাল। মেসোমহাশয়ের আমল থেকে কঞ্চির এক খাঁচা ছিল; সেই ভাঙা খাঁচা মেরামত করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখল। একটা টিয়াপাখি হলেই হয়। স্নেহশশী বলল, "পাখি আর পাবি কোথায়, ওই কানা কাকটাকে পুষতে শুরু কর।" বয়ে গিয়েছে ডুমুরের কানা কাক পুষতে। কোন ফাঁকে ডোমপাড়ায় গিয়ে হরিকে বলে এসেছে একটা পাখির কথা। টিয়া হক, ময়না হক, যা হক একটা ভাল পাখি।

নূপুর ঠাট্টা করে বলল, "ধরে দিতে বলেছিস, না তৈরি করে দিতে বলেছিস?"

"কেন ?" ডুমুর ভুরু কুঁচকে দিদির দিকে তাকাল।

"না, তাই বলছিলাম। ও ত ছুতোর ; কাঠের একটা পাখি তৈরি করে দিলে কালই পেয়ে যাবি।" নূপুর ঠোঁট টিপে হাসে।

কথাটা মিথ্যে নয়। হরি সুবল ছুতোরের ছেলে। একেবারে জোয়ান বয়স। বাপের কারবারে কাজ করে। আর কাজের মধ্যে মাঠকুড়িয়ার বাগানে গিয়ে পুকুরে মাছ ধরে।

দু' বোনের খিটিমিটি এ-রকম লেগেই থাকে। তবে, স্কুল বন্ধর জন্যে ডুমুরের মনটা এতই ভাল যে, নূপুরের সঙ্গে খুব বেশী কথা-কাটাকাটিও আর করে না। বরং মাঝে মাঝে নরম হয়ে যায় খুব। ভাবসাব করে, হাসি তামাশাও।

হরি সত্যিই সেদিন এক টিয়াপাখির ছানা এনে হাজির করল। তাকে খাঁচায় পুরে ডুমুর বলল, "দেখলি ত, কাঠের নয়, জ্যান্ত পাখিই এসেছে।"

"দেখেছি ; আমার চোখ আছে।" নূপুর একটু মুচকি হাসল।

হাসিটা ডুমুরের কেমন যেন লাগল।

তখন নয়, যখন দু' বোনে জল আনতে যাচ্ছে শিব-মন্দিরের কুয়ো থেকে, বিকেলের গোড়ায়, ডুমুর কথাটা তুলল। কাঁঠালগাছের ছায়া পেরিয়ে এসে করবী-ঝোপ আর বুনো তুলসীর ডালপালা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেতে যেতে ডুমুর বলল, "এই, তুই তখন অমন করে হাসলি কেন রে ?"

"কখন ?"

"সেই তখন—!"

নূপুর বুঝতে পেরেছিল কোন সময়ের কথা বলছে ডুমুর। তবু ন্যাকাবোকা সেজে আবার বললে, "তখন—তখন কি, কখন তা বল ; আর না হয় চুপ করে থাক।"

ডুমুর দিদির দিকে একবার তাকাল। করবীর একটা লম্বা

ডাল ওর বুকের কাছে এসে পড়েছিল। সরিয়ে দিতে দিতে ডুমুর বলল, "সেই যে তখন, হরিদা যখন পাখি দিয়ে গেল।"

নূপুর এবার ছোট বোনের মুখ দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে।

"এমনি হাসলাম।"

"মিথ্যে কথা বলছিস ?"

"ওমা, হাসির আবার সত্যি মিথ্যে কি! হাসি পেল, হাসলুম।"

ডুমুরের সন্দেহ তবু যায় না।

নূপুর এবার বলল, "হরিটা কেমন উজবুক রে—! আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম ওর ওপর।"

"কেন, কী করল ও ?"

"কেন কি, বাইরে থেকে কোন রকমে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে ফিরছি, গায়ে জামা-টামা কিচ্ছু নেই; ও হাঁদাটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। অসভ্য। সহবত জানে না।"

নূপুর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "ডোমপাড়ায় থেকে থেকে একেবারে ছোটলোক হয়ে গেছে।"

ডুমুর পলকেই রেগে আগুন। কালো মুখ আরও কালো করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "যা যা—ওই ত তোর বকের কত লম্বা কুঁজো চেহারা। তোকে আবার তাকিয়ে দেখবে কি রে!" হাতের বালতিটা পারলে বুঝি দিদির পিঠেই এক ঘা বসিয়ে দিত ডুমুর, এমন তার রাগে-আগুন চেহারা।

"হয়েছে কি ডোমপাড়ায় থাকে ত! কত লোকই ত থাকে; আমরাও। সবাই কি আমরা ডোম মেথর নাকি ?"

"উঁ, খুব যে টান।" নূপুর ভেঙিয়ে বলল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল।

ডোমপাড়ায় যে ডোমরা থাকে না, তারা আরও একটু দূরে

থাকে, নূপুর তা জানে। কিন্তু ছুতোর, কামার, মিস্ত্রি, মজুর—এরা ত থাকে। ডুমুরের নজরটা ওই দিকে।

আর তার—? নূপুর মনে মনে হঠাৎ নিজেকে প্রশ্ন করল।

টিয়াপাখির ছানাটার যত্ন আত্যি দেখলে নূপুরের গা জ্বলে যেত। স্নেহশশীর হাসি পেত। ছাতু গুলে গুড় দিয়ে পাখিটাকে যতই খেতে দিক ডুমুর, ওই পালক-ওঠা ছানাটা যে বাঁচবে না নূপুর তা জানত। তবু, ডুমুর যখন সেই পাখিটা নিয়ে আদিখ্যেতা করত, আর দিদির দিকে বেঁকা চোখে চেয়ে চেয়ে গালের উপর কেমন করে এক চাপা হাসি ফোলাত—যার অর্থ হচ্ছে দেখ্, তোর হিংসুটে চোখ নিয়ে চেয়ে দেখ্—তখন সেই হাসি দেখে নূপুর যেন কিসের চাপা রাগে অস্থির হয়ে যেত।

কী দেখবে নূপুর? ওই মরা হাজা পাখির ছানা; না তার বেশী আরও কিছু?

স্নেহশশীর কাছে এক সকালে আট আনা পয়সা চেয়ে বসল নূপুর।

"কী করবি পয়সা?" স্নেহশশী আমতলা থেকে কুড়ন ক'টা আম কেটে তেল দিয়ে মশলা দিয়ে মাখছিল আচার করার জন্যে।

"আধ দিস্তে কাগজ আর একটা পেন্সিল কিনব।"

"তাতে আট আনা লাগবে না। আনা পাঁচেক লাগবে।" স্নেহশশীর জবাবে কোনরকম তিরস্কার ছিল না।

নূপুরের মুখ ভার হল। চোখ ছলছল করে উঠল। মাথার একটা ফিতে কিংবা ক'টা কাঁটাও ত সে কিনতে পারে। সে কি চোর না ছ্যাঁচড় যে তিন আনা পয়সা ভোগা দিয়ে নিয়ে নেবে।

আট আনাই পেল নূপুর। তারপর বাড়িতে সাবানে রঙ করা ফিকে লাল শাড়ি পরে, পায়ে চটি গলিয়ে অমন কাঠফাটা রোদের এক শেষ দুপুরে বেরিয়ে গেল।

ফিরল বিকেলেই। আট আনা অনুপাতে সবই এনেছে। কাগজ পেন্সিল ফিতে। এবং ডুমুর দেখল, তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খুব লজেন্স চুষল নূপুর। এক সময় নিজে থেকেই শুধিয়েছিল, "বেশ টক ; খাবি একটা ?"

"না।" ডুমুর মাথা ঝাঁকাল, "তুই খা।" তারপর সারা ঠোঁটে আর নাকের ডগায় ভীষণ এক বিস্বাদ ঘেন্না জাগিয়ে বলল, 'ভিক্ষের জিনিস আমি খাই না।"

"কী বললি ?" নূপুর ছোট বোনের সামনে যেন ছুটে এসে দাঁড়াল।

"যা বলেছি ঠিক বলেছি।" ডুমুর অবিচল। "তোর চেয়ে আমি অঙ্ক ভাল জানি—; আমায় মাসি পাসনি যে যা খুশি বুঝিয়ে দিবি।" নূপুরের আর সহ্য হল না। ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল ডুমুরের গালে। "ছোটলোক, অসভ্য কোথাকার। বড্ড তোর মুখ হয়েছে, না ? কাকে কী বলতে হয় জানিস না।"

চড় খেয়ে ডুমুরের মাথার মধ্যে শিরায় যেন আগুন জ্বলে গেল। নূপুরের বিনুনিটা খপ করে ধরে ফেলল। তারপর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে হ্যাঁচকা এক টান। ছোট বোনের গায়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল নূপুর। এরপর—যা স্বাভাবিক—দু' বোনে খানিক আঁচড়া-আঁচড়ি খামচা-খামচি। স্নেহশশী বাড়ি থাকলে এতটা হত না।

ঝগড়ার শেষে রেষারেষির আবহাওয়ায় নূপুর বলল, "তোর মতন আমার নিচু নজর নয়। বেশ, আমি না হয় ভিক্ষে করি ; তুই বা কোন কমতি যাস। চেয়েচিন্তে ওই ত এনেছিস, মরাহাজা একটা পাখির ছানা।"

ডুমুরের চোখের কোনায় নূপুরের নখ লেগে ছড়ে গিয়েছিল। জ্বালা করছিল বেশ। আঙুল দিয়ে জায়গাটা রগড়াতে রগড়াতে ডুমুর জবাব দিল, "তোর মতন হাত পেতে চাইলে অনেক জিনিস আনতে পারি।"

"হ্যাঁ, সব পারিস তুই, জানা আছে।" নূপুর ফেঁসে-যাওয়া আঁচলের কাছটা কাঁধের ওপর তুলে বারান্দায় চলে গেল।

ডুমুরের টিয়াপাখিটা ধুঁকছিল। খাঁচার একপাশে বুকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে নেতিয়ে ছিল। স্নেহশশীর চোখে পড়তে বলল, "ওটার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে দে ওটাকে ডুমুর।"

ছেড়ে দিল ডুমুর। আতাগাছের পাতাভরা এক ডাল বেছে রেখে দিয়ে এল। বিকেলেই মরল পাখিটা। মরে মাটিতে লুটিয়ে থাকল।

দিন দুই ধরে দেখল নূপুর ফাঁকা খাঁচাটা। শেষে ঠাট্টা করে বলল ডুমুরকে, "খাঁচাটা আর মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিস কেন বাহার করে।"

ডুমুর কোন জবাব দিল না।

গরমের ছুটি ফুরিয়ে স্কুল খুলল আবার। দুপুরে স্কুল। নূপুর ডুমুর বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরয় অথচ বেশ আগুপিছু হয়ে স্কুলে পৌঁছয়। ফেরার বেলাতেও তাই। স্নেহশশীর সঙ্গে ওদের আসা-যাওয়ার সম্পর্ক থাকে না।

ডুমুরের প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্ছে আজকাল। আজ পেটে ব্যথা, কাল মাথা ধরা, কান কট কট, পায়ের গাঁট ফোলা। স্নেহশশী বলে, "এত কামাই করলে কি পড়াশোনা হয়।"

"হয় না ত হয় না; আমি তার কী করব?" ডুমুরের অখুশী গলা, "মরতে মরতেও কি পড়তে হবে নাকি?"

"বিনি মাইনেয় পড়া। অত কামাই করলে কি চলে? পরীক্ষায় পাশ করতে পারবি না। নাম কেটে দেবে খাতা থেকে।" স্নেহশশী ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

"দিক।" ডুমুর নির্বিকার।

স্নেহশশীর খুবই কষ্ট হয় এ-সব কথা শুনলে। "কত মেয়ে আছে, সুযোগের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পায় না, স্কুলটুলের মুখ দেখার ভাগ্য হয় না জীবনে। তোদের এত সুবিধে—তবু তোরা হেলায় হারাচ্ছিস। আমি যদি স্কুলে না চাকরি করতাম, পড়াতে পয়সা লাগত না? তখন মাইনে গুনে দু-বোনকে কি পারতাম স্কুলে পড়াতে? তা ছাড়া কত বেশী বয়সে সব স্কুলে ভর্তি হলি দু' বোনে। এখনও যদি এমন হেলা ফেলা করিস!"

ডুমুর চুপ করে মাসির কথা শোনে। পরের দিন কী খেয়াল হয়, বইপত্র বগলে করে স্কুলে যায়। দু' চার দিন নিয়মিত আশা যাওয়া; তারপর আবার আচমকা একদিন বেঁকে বসে। যাবে না স্কুলে।

নূপুরের কামাই নেই, অনিচ্ছা নেই, অনাগ্রহের ভাব নেই। বরং ডুমুর যে-দিন যায় না, সেদিন নূপুর আরও একটু তাড়াতাড়ি বেরয় বাড়ি থেকে, আরও একটু দেরি করে ফেরে। ছুটিটুটির দিন নূপুর বড় বেশী আনমনা। ডুমুর তা লক্ষ্য করে।

বর্ষার জলে ভিজে স্নেহশশীর ঠাণ্ডা লাগল। প্রথমে জ্বর। যাচ্ছে যাবে করে তিনদিন কাটল। তারপর পাকা হয়ে বসল। জ্বরের সঙ্গে আর পাঁচটা উপসর্গ।

মাসি অসুখে পড়ার পর থেকে ডুমুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে। নূপুরও কামাই করতে চেয়েছিল প্রথম প্রথম। কিন্তু তার নাইন ক্লাসের পড়া আর সামনেই পুজোর ছুটির পরীক্ষা বলে স্নেহশশী তাকে কামাই করতে দেয়নি। নূপুর তাতে খুশী হয়েছিল। বিকেলের দিকে রোজই ফেরার সময়টা বাড়তে লাগল। ফেরার পথে স্নেহশশীর ওষুধ আনতে রামেশ্বর ডাক্তারের দোকানে তার যাবার কথা নয়। তবু দেরি হয় কেন? দেরি ত হবেই। ছুটির পর মীরার বাড়ি গিয়ে ইংরিজীর মানেটা আনতে হয়েছে, সুব্রতার খাতা থেকে অঙ্কগুলো

টুকে না নিলে সাতান্ন প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো আর একটাও মাথায় ঢুকত না।

স্নেহশশী এতে খুশী। খুবই খুশী। পড়াশোনায় খুবই চাড় হয়েছে মেয়েটার। ঠাকুরের কৃপায় আর একটা বছর এইভাবে লেগে থাকে মেয়েটা। ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলে নূপুরের ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে তার স্পষ্ট একটা ছবি এঁকে রেখেছে স্নেহশশী। ডুমুর-নূপুরকেও বলেছে। "আমাদের স্কুলেই তোর চাকরি করে দেব। বড়দিদিমণি আমায় কথা দিয়েছে। আর এ-স্কুলে যদি নাও হয়, রেলের পাড়ায় মেয়েদের মাইনর স্কুল হচ্ছে—সেখানে তোর বাঁধা কাজ নূপুর। অনাদিদাদা আমায় ঠেলতে পারবে না।"

মাসির আড়াল ডুমুর বাঁকা হাসি হেসে বলে নূপুরকে, "তবে আর কি, তোর ত পাখা গজাল বলে।"

"তোর ত গজিয়ে গেছে এরই মধ্যে।" নূপুরের পালটা জবাব।

"দেখেছিস নাকি?" ডুমুর আরও নিষ্ঠুর হয়ে হাসে যেন।

"চোখ থাকলেই দেখা যায়। ভাগ্যিস মাসির অসুখটা করেছিল!" নূপুর ঠোঁট কামড়ে হাসে, "সাপে বর হয়েছে তোর।"

"তোরই বা কম কী! ফাউনটেন পেন পাচ্ছিস, সেণ্টের শিশি, একরাশ চিরকুট—এত কথাও লেখে তোকে।" ডুমুর ছুরির ফলার মতন শান দেওয়া চোখে তাকায়।

নূপুর আর তত চমকে ওঠে না। ভয় পায় না। ঘেন্নাই হয় ডুমুরের ওপর। অত সাবধানে লুকিয়ে রাখা জিনিসগুলো হাঁটকে হাতড়ে ঠিক খুঁজে বের করে দেখেছে হারামজাদী। বোনের চোখে চোখে চেয়ে নূপুর এবার বলে, "জিনিসগুলো তোর হরিদাকে চিনিয়ে দিচ্ছিস ত, ফাউনটেন পেন কাকে বলে, সেণ্ট কেমন দেখতে—। হ্যাঁ, ভাল করে চিনিয়ে দে ; না চিনলে জানলে বেচারা আনবে কী করে?"

স্নেহশশী সেরে উঠেছে। বড় কাহিল শরীর। জ্বরজ্বালা না থাক, দুর্বলতা বড় বেশী। একটু আধটু হাঁটাহাঁটি না করতে পারে এমন নয়—কিন্তু ইচ্ছেই করে না। সারাদিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হাত পা নাড়তেও আর ভাল লাগে না।

কদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল। মঙ্গলময়ী স্কুলের ও-পাশটা জল-থৈথৈ। ঝিলের জল বেড়ে অতটা ছড়িয়ে যাবে কে ভেবেছিল। আসলে ঝিলের জল নয়, মরা খাল দিয়ে, নদীর জল ঢুকে ঝিল ভাসিয়ে দিয়েছে।

জল না কমে যাওয়া পর্যন্ত স্কুল বন্ধ। দুদিন হয়ে গেল, এখনও জল সরছে না। নূপুরের অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আজ আবার সকাল থেকে আকাশ কালির মত কালো হয়ে গিয়েছে। আবার বুঝি শুরু হল। শুরু হলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না, সে-বৃষ্টি সহজে থামবে। হয়ত আবার তিন চারদিন একটানা চলল।

নূপুরের সারা মন তেঁতো, বিশ্রী, রুক্ষ হয়ে উঠল।

ডুমুর খুব খুশী। আ, এই বৃষ্টি চলুক না একটানা। যতদিন খুশি।

বৃষ্টি এল। একটু বেলায়। যেমন তোড়, তেমনি ফোঁটা। আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ভিজে শপশপ করতে লাগল। গাছ-পাতা চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। মাঠের খানা ডোবা ভরে গিয়েছে, ঘাসের ডগা তলিয়ে জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

বৃষ্টিটা প্রথম চোটে বেশী সময় নিল না। থেমে গেল। আকাশে শুধু আরও ঘটা বাড়তে লাগল।

খাওয়া দাওয়া সেরে স্নেহশশী বর্ষার এমন ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়ল। নূপুর ডুমুর কাজকর্ম সেরে ঘরের একপাশে মাদুর বিছিয়ে পড়ে থাকল। চোখ বুজে।

প্রথম ডুমুর উঠল। তখন দুপুর হবে। অনুমানে বোঝা যায়।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ইস আকাশ কী কালো। যেন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তেমনই অন্ধকার! ব্যাঙ ডাকছে। দূরের ছোট লাইনের গাড়ি যাচ্ছে—তার শব্দ। ও, তবে তিনটে বাজে প্রায়। বাড়ির বাইরে এল ডুমুর। কানা কাকটা খাপরার ফাঁকে গিয়ে বসেছে। আতাগাছটা ভিজে যেন শীতে কাঁপছে।

জলজমা মাঠে পা দিয়ে ডুমুর এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর কাপড় একটু তুলে সামনের কাঁঠাল আর আমঝোপের দিকে এগিয়ে চলল। তার চন্দনা আসব আসব করেও আসছে না।

নূপুর ছটফট করছিল। কান্না পাচ্ছিল তার। আজ নিয়ে তিনদিন। এক শুধু রবিবারে দেখা হত না বলে কী কষ্ট পেত ওরা। আজকাল রবিবারের দুপুরেও দেখা সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করা গিয়েছে। শিবমন্দিরের পথে। সেখানে বড় বেশী লতা পাতা ঝোপঝাড় —তার আড়ালে।

নূপুর বারান্দায় এসে ডুমুরকে দেখতে পেল না। কোথায় গেল? হয়ত পুকুরের দিকে। শিবমন্দিরের দিকে যাবে কি যাবে না—একটু ভাবল নূপুর। যার জন্যে যাওয়া সে যদি না আসে?

আসবে। না এসে পারে না। আজ নিয়ে তিন দিন। তিন দিন দেখা নেই, পাগল হয়ে গিয়েছে না!

নূপুর পা বাড়াবার আগে টিকটিকির ডাক শুনল।

আকাশে আরও ঘন করে মেঘ জমে উঠেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। গাছের পাতার আড়াল থেকে ক্লান্ত পাখিরাও মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে। টুপটাপ জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে হাওয়ায় গাছের পাতা থেকে। কেমন সব ফাঁকা। যেন এ-জল এ-মাটি এমন বাতাস—এখানে নেই।

নূপুরের মোহ হঠাৎ যেন সাপের ছোবল দেখে চমকে উঠল।

জলের ওপর খসে পড়া আঁচলাটা তুলে নিয়ে কঁকিয়ে উঠল নূপুর। ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল।

মাধব ছাড়বে না। ফিস ফিস করে কী যেন বলছে। হাত বড় শক্ত আর গরম মাধবদার।

নূপুর একরকম সবটা জোর দিয়ে ধাক্কা দিল মাধবকে। তারপর বুনো লতাপাতার ঝোপের উপর লাফিয়ে পড়ল।

নূপুর প্রথমটা ছুটছে। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। ও কাঁদছিল। কান্নাটা তার কানে যাচ্ছে না। আর কানে যাচ্ছে না বুকের তলায় রাখা ঘুঙঘুরটার হাসির শব্দ। অথচ তার শব্দটা হাঁটার তালে তালে বাজছিল।

বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়ে নূপুর পাথর। সামনে দাঁড়িয়ে স্নেহশশী। ডুমুরও মুখ নিচু করে মাসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওর কাপড় জামা কাদায় জলে একশা। হাতে ছোট্টমতন এক খাচা।

স্নেহশশী চৌকাঠ ধারে খানিকটা সময় বোনঝিদের দিকে কেমন অদ্ভুত, শূন্য, অর্থহীন আর গভীর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল, কথা বলল না। নিশ্বাস ফেলল। শব্দটা নূপুর-ডুমুরের কানে গেল।

আরও একটু চুপচাপ থেকে স্নেহশশী বলল, "বাড়িটা ভেবে-চিন্তে ঠিক জায়গায় করেছিল সে-মানুষটা। সংসার সে চিনত, বুঝলি ?"

স্নেহশশী আর কোন কথা না বলে ফিরে গেল। বাড়ির মধ্যে।

অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নূপুর পা বাড়াতে যাচ্ছিল, জামার তলা থেকে বুকের কাছে ঘুঙুরটা বেজে উঠল। চমকে উঠল নূপুর। ডুমুরের দিকে তাকাল একবার। তারপর ঘুঙুর জোড়া বের করে মাঠের জলেকাদায় ছুঁড়ে দিল।

দু বোনই চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ক পলক। আকাশে মেঘ ডাকছিল। ডুমুর উঁচু হয়ে চাইল। ঘনঘটা মেঘ। হরির দেওয়া চন্দনাটাও ডুমুর ছেড়ে দিয়েছে। আর দিদির মতনই কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে ছুটতে এসেছে। হাতের খাঁচাটা যেন থেকেও ছিল না। এবার বুঝতে পারছে ডুমুর। খাঁচাটা ছাইগাদার দিকে ছুঁড়ে দিল।

নূপুর ডুমুর পাশাপাশি চৌকাঠ ডিঙোবার জন্যে পা বাড়ল।

———

ইঁদুর

অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে যতীন।

আর একটু হলেই ডান হাতের আঙুল কটা ওর ইঁদুর-মারা কলে থেঁতলে যেতো। র‍্যাশন-আনা ক্যাম্বিসের থলেটা বার করতে হাত বাড়িয়েছিলো বেঞ্চির তলায়। কে জানতো, ওরই তলায় ওৎ পেতে বসে আছে সর্বনেশে কলটা। লোহার ধারালো দাঁত আঙুলে ফুটতেই চট্ করে হাত সরিয়ে নিয়েছে, তাই না রক্ষে।

সাবধানে কলটাকে বাইরে টেনে আনে যতীন। তীক্ষ্ণদন্ত ইস্পাতের যন্ত্রটা হাঁ করে রয়েছে; সদ্য-ধার-দেওয়া অর্ধচন্দ্রাকার দুটি করাতের ফলা শিকার ধরার সম্ভাবনায় তখনও অপেক্ষমান।

—কই, শুনছো, শীঘ্রি একবার এসো তো এখানে! রুক্ষগলায় হাঁক পাড়ে যতীন।

সামনে দালানে বসে বাসি রুটিগুলো দালদায় ভেজে নিচ্ছে মলিনা। বসে বসেই উত্তর দেয়, 'আমার হাত জোড়া। কি বলছো বলো?'

—এখান থেকে বললেই যদি হবে, তবে তোমায় সোহাগ করে ডাকছি কেন? ঘরে এসে স্বচক্ষে তোমার কাণ্ডটা একবার দেখে যাও।

যতীনের তাগিদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না মলিনা। পরিপাটি করে স্বামীর জলখাবারের থালা গুছোয়। দালদায় লালচে করে ভাজা খান চারেক বাসি রুটি, দু টুকরো বেগুন ভাজা, একটু গুড়।

স্বামীর দিকে জলখাবারের থালাটা এগিয়ে দিয়ে মলিনা বলে, 'অমন করে হাঁক পাড়ছো কেন, হয়েছে কি?'

—হয় নি; তবে আর একটু হইলেই মোক্ষম একটা কিছু হতো—! মুখ চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে যতীন কলটার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মেঝের দিকে তাকিয়ে মলিনা একটু অবাকই হলো হয়তো।

—ওটা আবার টেনে বের করতে গেলে কেন?

—না, বার করবো কেন, ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দি; তারপর আমার আঙুল কটা উড়ে যাক, না হয় তোমার পায়ের গোড়ালি—? রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে যতীন মুখ কুঁচকোয়।

—আহা, কি আমার বাক্যি রে—ঃ মলিনা স্বামীর প্রতি ভ্রূভঙ্গি হেনে মেঝেতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলে, 'ধান ভানবো মরণ কালে, দাঁড়িয়ে থাকি ঢেঁকিশালে। কবে তোমার হাত কাটবে, পা কাটবে, তাই ভেবে সিন্দুকের মধ্যে পুরে রাখি!'

আহার-পর্ব শুরু হয়েছে। তবু চটেমটেই উত্তর দেয়, যতীন, 'মেয়েলি শ্লোক কেটো না। আর একটু হলেই তো আমার আঙুল কটা সাবাড় হয়ে গিয়েছিলো, মরণকাল পর্যন্ত তোমায় আর ঢেঁকিশালে অপেক্ষা করতে হতো না!'

ইঁদুরকলে হাত দিয়েছিলো মলিনা; স্বামীর কথাটা কানে যেতেই হাত সরিয়ে নিলো! তাকালো যতীনের মুখের দিকে।

—বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়েছিলে কেন?

—থলে বের করতে।

—একটু আর তর সইছিলো না, যতো রাজ্যির জিনিসপত্র হাঠকাতে লাগলে। উষ্ণস্বরে বলে মলিনা; ইঁদুরকলটা ঠেলে এক পাশে সরিয়ে রাখে।

বেঁকা চোখে যতীন স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলো। কলটা সম্পর্কে এতটা তাচ্ছিল্য তার মনঃপূত নয়।

—আবার, আবার সেই—কথাটা গ্রাহ্যি হলো না?

—না, হলো না। মলিনা উঠে দাঁড়ায়। কথা দিয়েই ও যেন ধমকে দেয় যতীনকে, 'অযথা তুমি সর্দারি করো না তো! আমার সংসার, আমি যা ভালো বুঝবো করবো।'

—কোথায় ইঁদুর তার ঠিক নেই কল পেতে বসে আছে! যতীন বিড়বিড় করে।

—কোথায় ইঁদুর তুমি তার কি জানো? আমি বুঝি, তাই কল পেতে বসে থাকি! তুমি মাথা ঘামাও কেন? পাল্টা জবাব দেয় মলিনা। কথার শেষে ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্ত্রীর অহেতুক একগুঁয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠে যতীন।

চায়ের কাপ হাতে করে একটু পরেই মলিনা আবার ঘরে ঢোকে।

—টাকা নেবে না? স্বামীকে লক্ষ্য করতে থাকে মলিনা।

—নোবো না তো টাকা পাবো কোথায়? মুফতিতে র‍্যাশন দেবে, অফিসটা আমার শ্বশুর বাড়ি কি না! এঁটো থালাটা মেঝেতে রাখতে রাখতে মেজাজী গলায় বললে যতীন। চায়ের কাপটাও উঠিয়ে নিলে।

—আবার সেই কথা? কতোদিন না বলেছি আমার বাপ-মা নিয়ে যা মুখে আসে বলবে না! চট করে চটে ওঠে মলিনা।

—বয়েই গেছে আমার তোমার বাপ-মা নিয়ে কথা বলতে!

—ও। শুনি তবে শ্বশুরটা তোমার কে?

মলিনার কথার কোনো জবাবই দেয় না যতীন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে বেরিয়ে পড়তে পারলেই ও যেন বাঁচে।

মলিনা নিরুত্তরে র‍্যাশনের থলে গুছোয়; বাক্স খুলে টাকা বের করে তক্তপোশের ওপর রাখে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছে যতীনের। পায়ের মোজাটা ঠিকঠাক করে হাঁটুর নিচে দড়ি বাঁধে। তাক থেকে পেন্সিল আর নোট খাতাটা উঠিয়ে নিয়ে বুক-পকেটে গোঁজে। তারপর একটা বিড়ি ধরায়।

—আর টাকা? পাঁচ টাকার নোটটা হাতে করে যতীন স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

— টাকার গাছ আছে নাকি আমার – যা ছিল দিলুম। দুটো টাকা আর বাজারের আছে। ভালো কথা, বাজার করে দিয়ে যেও! মলিনার গলায় বেশ ঝাঁঝ।

একটু বুঝি হতভম্ব হয়ে পড়ে যতীন; চট করে জবাব খুঁজে পায় না। সামলে নিয়ে বলে, 'পনেরো দিনের র‍্যাশন পাঁচ টাকায় হয় নাকি? ফি বার তো দিচ্ছো।'

—এবারে নেই তো দেবো কোথেকে? চুরি বাটপাড়ি করবো? ফিরতি প্রশ্ন মলিনার।

এক মুহূর্ত স্ত্রীর-মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যতীন বলে, 'বেশ। পাঁচ টাকায় যা হয় নিয়ে আসবো।' কথার শেষে নোটটা খাঁকি হাফ-প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়।

যতীন বেরিয়ে যাচ্ছিলো মলিনা বললে আবার, 'বাজার করে দিয়ে যাও।'

—সময় নেই। আটটায় ডিউটি, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

—ভালোই তো, আমার আর কি, ডালভাত রেঁধে রেখে দেবো। আমার মুখে সব রোচে।

— আমার-ও! যতীনের জবাব।

— কিন্তু তোমার বন্ধুটির? তাঁর তো আজ সকালেই ফিরে আসার কথা। সন্ন্যাসী মানুষ, তায় আবার প্রাণের ইয়ার পঞ্চা তেলি। ফল চাই, মুলো চাই, কলা চাই! কোনো ত্রুটিটুকু হবার যো নেই। হলে তোমার মাথা কাটা যায়; আর আমার বাপ ঠাকুরদাকে সগ্‌গো থেকে টেনে এনে হেলাফেলা করা হয়—। তাকের ওপর অযথা ঘুঁটিনাটি কি একটা গুছোতে গুছোতে ভারি গলায় বললে মলিনা।

— বাসু আজই কল্যাণেশ্বরী থেকে ফিরছে নাকি? যতীন ঘুরে দাঁড়ায়।

—কি জানি, বলে তো গেছে—

—হুঁ। যতীন মাথা নাড়তে নাড়তে টানা একটা শব্দ করে মুখ বুজেই। তারপর মুখ খোলে, 'আমার আর সময় নেই। যা হয় ক'রো।'

দালানে নেমে যতীন তার ঝড়ঝড়ে সাইকেলটার চাকা পরখ করছে, দেখছে পাম্প আছে কি না—শুনলো ঘর থেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মলিনা বলছে, 'করবো আবার কি ? আমি কিচ্ছু করবো না রোজ রোজ পরকে পায়ে ধরে সেধে বাজার আনানো। আমি আর কাউকে সাধাসাধি করতে পারবো না—যা আছে ঘরে তাই ফুটিয়ে রেখে দেবো! এতে কার পেট ভরলো না, মন উঠলো না, অতো আমার দেখার দরকার নেই।

যতীন চলে গেলো। খোলা দরজা দিয়ে দেখলো মলিনা—সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে সেই একই ভাবে স্বামী তার প্রস্থান করলে। ওর চলে যাওয়ার ভঙ্গীটাই এমন যা থেকে মনে করা যায় সকালবেলার দাম্পত্যকলহের জের সবটুকু স্ত্রীর কাছে জিম্মা দিয়ে ও নিজে খালাস পেলো ; চলে গেলো।

মলিনা দু'চার মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো—শুধুশুধুই। তারপর ঘরের চারপাশটা লক্ষ্য করলে একবার। পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল এঁটো বাসন আর কাপ দুটো নিয়ে দালানে রেখে এসেছে। আবার একবার বিছানা ঝাড়লো ; ঘর ঝাঁট দিলো। জলের ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগলো ঘরের মেঝে।

বসে বসে উবু হয়েই ঘর মুছছিলো মলিনা। বেঞ্চির কাছে আসতেই ইঁদুরমারা কলটা আবার তার চোখে পড়ে। ঠিক আগের মতই মুখব্যাদান করে বসে আছে যন্ত্রটা। হাতের কাজ থামিয়ে মলিনা একমনে তাই দেখে।

এই নিয়েই তো যতো গণ্ডগোল, মলিনা ভাবছিলো : অফিস

যাবার আগে অযথা কথা কাটাকাটি। যতীন হয়তো রাগ মনেই পুষে রাখলো। অফিসে একটা কেলেঙ্কারীও বাঁধাতে পারে—চাই-কি দুপুরে হয়তো খেতেই আসবে না বাড়িতে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েছে বইকি। বাড়িতে কিছু বলে নি যতীন, ওকে দেখে বোঝবারও উপায় ছিলো না, রাগের আঁচে তেতে আছে তার মন। মলিনা বসে আছে তো বসেই আছে—দুপুর গেলো, বিকেল গেলো—সেই সন্ধের গোড়ায় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ফিরলো যতীন। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, চোখ বসে গেছে। কোথায় ছিলে, কেন দুপুরে খেতে আসো নি, কি খেয়েছো ? জানো, তোমার জন্যে আজ একটু ইলিস মাছ আনিয়ে ঝাল রেঁধেছি, বড়ি ভেজেছি, টক করেছি লাউয়ের। আর হ্যাঁ মশাই, আমিও দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে আছি সারাদিন। থাক থাক, সোহাগ দেখাতে হবে না। কতোই তো বউয়ের ওপর টান। তাই তো—! মলিনা অভিমানে কেঁদে ফেলেছে। তখন যতীন ওর কান্না থামিয়েছে—চোখের জল দিয়েছে মুছে। বলেছে, আর কখনোও এমন গর্হিত কর্ম করবো না, লক্ষ্মীটি ; সত্যি বলছি, মাইরি, তোমার দিব্যি। ··আবার ওরা জোড় বেঁধে থালা সাজিয়ে খেতে বসেছে, গল্প করেছে হিজিবিজি, হাসিতে হাসিতে ছোট্ট ঘরখানাও যেন হেসে উঠেছে।

আনন্দে খুসিতে, পরিচ্ছন্নতায়, নিবিড় সাহচর্যে এই ছোট্ট ঘরখানা হেসে উঠুক, খুসিতে টইটুম্বুর হয়ে থাক ওরা দুজন, দুটি মন ; মলিনা তো তাই চেয়েছে। তাইতো এতো। কিন্তু এটা বাড়ি নয়, বস্তি। তবু বাড়িই বলো। এমন বাড়িতেই তো তাদের মত গৃহস্থরা থাকে এখন। খোলার চালের ঘর একখানা আর একফালি দালান। সামনে একটু মাটির উঠোন। ভাড়া কুড়ি টাকা। তাও অনেক ধরা-কওয়া করে ; নয়তো এই বাড়িরই নাকি ভাড়া ছিলো চব্বিশ।

অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে মলিনা এ বাড়িতে পা দিয়েছিলো। কিন্তু

প্রথম দিনই ঘরে ঢুকে সমস্ত উৎসাহ যেন হঠাৎ উবে গেলো। কেমন যেন ফ্যাকাসে, ভয় পাওয়া মুখে প্রশ্ন করলে, 'কু-ড়ি টাকায় এই বাড়ি ?'

বিছানা খুলছিলো যতীন। লণ্ঠনের আলোয় মলিনার মুখভাব তেমন ভালো করে দেখতে পেলো না।

—কুড়ি টাকা একরকম তো সস্তাই। সে আসানসোল আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেলো। বাড়ি—তা যেমনই হোক, মানুষকে বাঁচতে হলে চালচুলো তো রাখতেই হবে। খড়ের ছাউনি, খোলার চাল, টিনের চালা—চোখের পলকে এক-একটা রাজত্বি বনে গেল। এই খোলার ঘর তিন বছর আগে তিন টাকাতেও ভাড়া হতো না। আর এখন—। বিছানা খোলা শেষ করে যতীন হাঁফ ছাড়লো।

লণ্ঠন নিয়ে মলিনা তখন ঘরের ইতি-উতি দেখছে। ইস্ মাগো ঘরের মেঝের কি ছিরি। সিমেণ্টের একটা পাতলা প্রলেপ না থাকলে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরই তারা দাঁড়িয়ে থাকতো। সিমেণ্টেও কি আছে নাকি—ফেটে ফুটে একাকার। ঘরের এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত—দেওয়ালে চিড় ধরেছে; আর মাথা; কোন্ যুগের ছেঁড়া চট্ দিয়ে সিলিং করা, এখনও তাই টিকে আছে। তবু রক্ষে যেমন-তেমন করেও ঘরে সদ্য একবার কলি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বাড়িওয়ালা। এখনও চুনের গন্ধ ভাসছে। নয়তো দুর্গন্ধেই প্রাণ যেতো।

—ও, মাগো—হঠাৎ বিশ্রী রকম ককিয়ে উঠলো মলিনা। ধড়মড় করে চৌকির ওপর লাফিয়ে উঠতে গেলো। লণ্ঠনটা চৌকিতে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়লো মেঝেতে। দপ্ দপ্ করে লণ্ঠনের কাঁপা অসম, এলানো শিষটা কাঁচের মধ্যে কিলবিল করলো, জমলো খানিকটা ধোঁয়া, আর তারপরই সব অন্ধকার। নিকষ কালো রঙে সবকিছু ডুবে গেলো, মুছে গেলো।

—কি হলো ? এ্যাঁ—? যতীন উদ্বেগভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—ইঁদুর! মলিনার গলার স্বর দ্রুত, হ্রস্ব, আতঙ্কভরা।

– ইঁদুর! যতীন প্রথমে বোবা, তারপর তাচ্ছিল্যমাখা তরল সুরে প্রত্যুত্তর দিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে, 'বাব্বা! যেমন করলে তুমি, আমি চমকে উঠেছিলুম। ভাবলাম না জানি সাপ খোপ হবে।'

লণ্ঠন জ্বালালো যতীন। মলিনাকে দেখলো। ওর মুখচোখ তখনও ভয় লেপ্টে রয়েছে।

—আরে, অমন মুখ করে বসে আছো কেন ? মনে হচ্ছে যেন—

যতীনের কথায় বাধা দিয়ে মলিনা বললে. 'কই, দেখি, তোমার হাত দেখি। দেখো আমার বুকটা এখনও ধক্‌ধক্ করছে।' যতীন হাত দিয়ে অনুভব করলো; সত্যিই মলিনার হৃদপিণ্ড দ্রুততালে বেজে চলেছে।

—আশ্চর্য, এতো ভয় তোমার ইঁদুরে।

—তা বাপু, ভয়ই বলো আর ঘেন্নাই বলো, ওই বিদিকিচ্ছি জন্তুগুলো দেখলে আমার গা গুলিয়ে আসে। আস্তে আস্তে জবাব দিলো মলিনা বিকৃত মুখভঙ্গী করে, স্বামীর চোখে চোখ রেখে। একটু থেমে বললে আবার, 'এ বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েই আমার জন্মশত্তুরগুলো চোখে পড়লো। তখন থেকেই গা বিড়োচ্ছে। তার ওপর পড়বি তো পড়, হতভাগা একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো গা।'

—আজব কাণ্ড তোমার! যতীন বললে, 'ইঁদুর কোথায় না থাকে ?'

—থাক্, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে থাক; আমার ঘরে থাকা চলবে না। দু চোখের বিষ আমার। পাজি, নোংরা, কুচ্ছিৎ মলিনার ঠোঁট, চোখ, নাক, মুখ ঘৃণায় কুঁচকে কুশ্রী হয়ে উঠলো।

মুখে যা বলেছিলো মলিনা—সেইদিন সেই প্রথম এ বাড়িতে

পা দিয়ে, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলিয়ে ছেড়েছে। প্রথম দিন থেকেই, মলিনার সে কি অসাধ্য সাধন। মেঝেতে কোথায় গর্ত, দেওয়ালে কোন্ কোণে ফাটল, দালানে জঞ্জাল জড় করা কেন—এ সবের মধ্যেই তো ইঁদুরের রাজত্ব। ইঁটের গুঁড়ো, কাঁকর, বালি' পাথরকুচি যা পায় ঠেসে ঠেসে গোঁজে ভরাট করে গর্তের ফাঁক, তারপর মাটি দিয়ে লেপে দেয়। যতীনদের ডিপোতে শেডের কাজ হচ্ছে, অফিস-ফেরতা পথে যতীন ভোলাবাবুর কাছ থেকে সিমেণ্ট চেয়ে রুমালে বেঁধে আনে। একটা কুর্ণিকও কিনে আনলো একদিন। সারা দুপুর কোমরে কাপড় জড়িয়ে মিস্ত্রিগিরি করে মলিনা।

একটু হয়তো বাড়াবাড়িই হবে এই ইঁদুর-ভীতি। তবু কে অস্বীকার করবে ইঁদুর তাড়াতে গিয়ে মলিনা ঘরের শ্রী পাল্টে দেয় নি। আসলে তাই। কুড়ি টাকার খোলার ঘর মলিনার হাতে পড়ে শ্রী পেলো। সৌখিন না হোক শোভন হলো। যতীন মনে মনে ভাগ্যবান মানলো নিজেকে। লক্ষ্মীমন্ত বউ তার ; দেখতে না দেখতে সংসারের হাল ফিরিয়ে দিলে।

ঝকঝকে, তকতকে করে ঘর সাজালো মলিনা। কাঁঠাল কাঠের তক্তপোশ, একটা বেঞ্চি, দুটো জল চৌকি, কেরাসিন কাঠের তেথাকা—এমনি সব টুকিটাকি জিনিস। প্রথম ক'টা মাস খুবই টানাটানি চলে সংসারে। মাইনের একশোটা টাকা থেকে বাঁচিয়ে এটা ওটা কেনা কি সহজ।

যতীন একদিন ঠাট্টা করেই বলেছিলো, 'ভাগ্যিস ভগবান আমায় রাজা করে নি গো! বেঁচে গেছি—!'

কেন ? জানতে চেয়েছে মলিনা অবাক হয়ে। যতীন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছে, 'তা হলে তো তুমি প্রাসাদ বানাতেই ব্যস্ত থাকতে। এ অধম তোমার প্রসাদ পেতো না।'

যতীনের কথায় হেসে ফেলেছে মলিনা ; স্বামীর গলা জড়িয়ে

ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়েছে কানে, আধো-আধো স্বরে বলেছে, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, তোমার অতো কাব্যি কি বুঝি— ! তুমি যদি রাজা হতে আমি কি আর রাণী হতাম !'

—রাণী হতে না—? তবে হতেটা কি ! চোখ বড় বড় করে রহস্য করেছে যতীন।

—দাসী ! ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছে মলিনা।

—বলো কি, এতো থাকতে দাসী ?

—হুঁ, দাসী-ই। যা ময়লা রং আমার, বাপ-মা দেখে শুনেই নাম দিয়েছে মলিনা। রাণী কি ময়লা হয় ! মলিনার গলার স্বরে আশ্চর্য জড়তা এসেছে কথাগুলো বলতে গিয়ে।

যতীন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠেছে, 'বয়েই গেছে ; হোক না গায়ের রং ময়লা—মন তো আর ময়লা নয়।'

তাই মলিনার মন ময়লা নয়। অন্তত মলিনা যেন সেই কথাটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে বলে মনে হয়। ময়লার উপর তাই কি ওর অতো বিজাতীয় ঘৃণা ? নোংরা যা কিছু, কুৎসিতদর্শন যেখানে যা আছে, এমন কি বিকৃত, বীভৎস যা ; চোখকে যা পীড়া দেয়, মনকে অসুস্থ করে, মলিনার কাছে তার এতটুকু দয়া নেই, ক্ষমা নেই।

ইঁদুরকে ঠিক এই জন্যেই বুঝি এতো ঘেন্না মলিনার। দেখতে যেমন, থাকেও তেমনি অন্ধকার নোংরা আবর্জনার স্তূপে। একটু ভালো করবে তোমার—বয়েই গেছে, বরং ক্ষতির বহরটা একবার হিসেব করে দেখো। চাল, ডাল, তরিতরকারি, কাপড়, বই—সর্বত্র ওর সমান গতি। আর নষ্ট করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই।

তালপুকুরের ঘরে অতো যে ইঁদুরের উৎপাত, সে উৎপাতও বন্ধ করলো মলিনা। এলো ইঁদুর-মারা কল, তারপর এলো বেড়াল, শেষ পর্যন্ত ইঁদুর মারা বিষ।

মলিনার সংসার থেকে একদিন দূর হলো এই নোংরা জীবগুলো। একেবারেই। চিরকালের মতই।

তারপর? তারপর তো বেশ ছিলো মলিনা। হঠাৎ আজ ক'দিন থেকে কেমন করে যেন একটা ইঁদুর আবার এসে পড়েছে। শব্দ শুনছে মলিনা, বুঝতে পারছে। কিন্তু কই দেখতে তো পায় না—কিছুতেই ধরতে পারেও না।

কে! মলিনা চমকে উঠলো। কে যেন ডাকলো।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো মলিনা। হাতে তার ইঁদুর-কল। দরজার কাছে সরে আসতেই উঠোনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল মলিনার। মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবাস, দীর্ঘদেহ একটি মূর্তি। সর্বাঙ্গ ভরে রোদ আর তপ্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—ফিরলাম কল্যাণেশ্বরী থেকে। উঠোন থেকে স্বর ভেসে আসে, 'সব যে বড় চুপচাপ। যতীন কই? অফিস বেরিয়ে গেছে?'

বাসুদেব উঠোন থেকে দালানে উঠে আসে।

মলিনার হাত থেকে কলটা পড়ে যায়। একেবারে পায়ের কাছেই। শব্দ কানে যেতে ও সম্বিত ফিরে পায়। পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখে মাটিতে কলটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে—করাতের ফলার মত মুখ দুটো বন্ধ। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে মলিনা বলে, 'আসুন। আপনার বন্ধু তো অনেক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছে।'

দুপুর বেলায় খেতে এলো যতীন; রোজ যেমন আসে।

ঘরে পা দিতেই বাসুদেবের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—করেছিস কি রে—এঁ্যা—! মাথা কামিয়ে এলি কল্যাণেশ্বরী থেকে?

নিজের মাথায় নিজেই হাত বুলিয়ে বাসুদেব হাসলো, 'খারাপ দেখাচ্ছে!'

—না, খারাপ কেন হবে? একেবারে মঠের মহারাজের মত দিব্যি দেখাচ্ছে। ঠাট্টা করে যতীন।

—দীক্ষা নিলুম কি না—তাই।

গায়ের জামাটা আলনায় টাঙিয়ে যতীন ঘুরে দাঁড়ায়, 'দীক্ষা—!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বাসুদেব। চুপ করে থাকে, হাসে মুচকি মুচকি। বন্ধুর হাসির অর্থভেদ করতে না পেরে যতীন বলে, 'দাঁড়া, মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে নি—তারপর তোর দীক্ষা নেওয়ার কথা শুনছি!'

স্নান সেরে খেতে বসলো যতীন; পাশে বাসুদেব। মলিনা বাসুদেবের সামনে থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল পরিপাটি করে। তারপর স্বামীর। আর এক দফা অবাক হবার পালা যতীনের।

—ব্যাপার কি? আমি ভাত, তুই রুটি? যতীন বাসুদেবের পাতের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রশ্ন করলে।

—আমি নিরামিস আর তুই আমিস! আমার পাতে দুধ কলা, তোর পাতে কিন্তু ভাই, কাঁচকলা। বাসুদেব উচ্চগ্রামে হাসে।

ততক্ষণে মলিনা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—খেতে খেতে বাসুদেব বলে, 'আজ পূর্ণিমা, ভাত খাওয়া নিষেধ।'

—কার নিষেধ, তোর গুরুদেবের? যতীন চোখ তুলে তাকায়।

—না। নিজে থেকেই খাই না। বাসুদেব আড়চোখে মলিনার দিকে তাকালো।

খেতে বসে গল্‌গল্‌ করে ঘামতে শুরু করেছে যতীন। বাসুদেবেরও মুখে ঘাড়ে ঘাম জমে উঠেছে। মলিনা চুপটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। যতীনের খোলা গায়ে ঘামের প্রাবল্য একটু বোধ হয়

দৃষ্টিকটুই হবে। অথচ তারই পাশে বসে বাসুদেব। ধবধবে ফর্সা গোলগাল মুখের ছাঁদ লোকটার। কপালটাও তেমন চওড়া নয়। ভরাট গলা। ঘাম জমেছে ফোঁটা ফোঁটা, সাড়া মুখ ভরে। ভিজে চন্দন দিয়ে মুখে তিলক আঁকলে বুঝি এমনই দেখায়।

—তোমার পাখা নেই? যতীন মলিনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

কি যেন ভাবছিলো মলিনা। স্বামীর কথা কানে যায় নি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তাকিযে থাকে।

—কি? নেই পাখা? যতীন আবার জানতে চায়।

মলিনা ঘর থেকে পাখা নিয়ে আসে।

' —জোরসে একটু বাতাস করো তো। খাবো কি, ঘামেই মলুম। যা ভ্যাপ্‌সা গরম। ভিজে গামছায় বুক মুছে যতীন বললে।

—কাল কল্যাণেশ্বরীতে বৃষ্টি হলো! বাসুদেবও কপালের ঘাম মোছে।

—পাহাড়ি জায়গা তো; ওখানে তুই এতো গরম পাবি না।

—কই, দিনের বেলায় এমন আর কম কি? রাত্তিরে অবশ্য ঠাণ্ডাই।

—কোথায় ছিলি রাত্তিরে?

—মন্দিরে। বেশ লাগলো। এক সাধুর সঙ্গে দেখা; কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। বয়স হয়েছে তাঁর। আশ্রম আছে দেওঘরের দিকে। গৃহী অথচ সাধু। আশ্চর্য! বাসুদেব কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে।

—ব্যাস্ আর কি! সাধু মানুষ, বয়স হয়েছে, আশ্রম আছে, তুই একেবারে গলে গেলি! যতীন জোরে হেসে উঠলো, 'দীক্ষাটাও চট্ করে নিয়ে নিলি, কি বল্?'

বাসুদেব ওর স্বভাবমত মুচকি হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

—ওঁর আশ্রমে আপনার একটা জায়গা হলো না? মলিনা ঠোঁট কুঁচকে হাসলো।

মলিনার মুখের হাসি তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ঢাকতে পারলো না। বাসুদেব আবার আড়চোখে তাকালো। তেমনি ভাবেই মাথা নাড়লো আবার, 'না। আমি তো জায়গা খুঁজিনি।'

—খুঁজলেই পারতেন। আশ্রম না হলে সন্ন্যাসীদের মানাবে কেন! হাতের পাখা জোর হয়ে ওঠে মলিনার।

আশ্চর্য, এতো জোরে বাতাস করছে মলিনা তবু যতীন ঘামছে। বাসুদেবের মুখেব ঘাম কিন্তু শুকিয়ে গেছে।

—আমি তো সন্ন্যাসী নই। বাসুদেব আস্তে আস্তে বললে।

—সন্ন্যাসী নন্ তো গেরুয়া পরেন কেনো? মলিনার রুক্ষ দৃষ্টি বাসুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে মিলে যায়।

—এমনি। ভালো লাগে তাই। সুবিধেও তো কম নয়। বিনি টিকিটে ট্রেণে চড়ি—কারুর বাড়িতে গেলে দু'বেলা অন্নও জুটে যায়। এ ও প্রণাম করে—দু'চার পয়সা দেয়। মন্দ কি! দিন তো চলে যাচ্ছে? বাসুদেব যেন কৌতুক করছে—এমনিভাবে কথাগুলো বলে। পরিহাসের তরলতা তার গলায়। পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বাসুদেব এবার যতীনকে বলে, 'কি রে, ঠিক বললুম না?'

—উঁহুঁ! নেহাতই বাজে কথা! যতীন উত্তর দেয়।

—কি রকম?

—ওর আর কোনো রকম নেই! ঘরে মা নেই, থাকলে তোর বিয়ে দিতো। তখন বউয়ের ভেঁড়ুয়া হতিস। বউ নেই তাই গেরুয়া ধরেছিস। যতীন বললে মুরুব্বি চালে। তাকালো মলিনার দিকে।

ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে যে ভারী আবহাওয়া জমে উঠেছিলো যতীনের কথা আর হাসিতে তা অনেকটা ফিকে হয়ে এলো। সশব্দে হেসে উঠলো বাসুদেবও।

মলিনাও হাসলো। তবে তার হাসি শব্দবহুল নয়—এমন কি কৌতুক-স্নিগ্ধ সহজ সাদা হাসি যে তাও নয়। বরং মলিনার ঠোঁটের কোণে যে বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার জের টেনে ও কথা বললে বাঁকা সুরেই, "বেবাগী লোকের বউতে কি যায় আসে? কথায় আছে না, তাই, 'থাকলে সর, না থাকলে পর'।"

বেফাঁস কথাটা মলিনার মুখ থেকে কেমন করে যে বেরিয়ে গেল সে বুঝতেও পারলে না। জিবকে রাশ বেঁধে সব সময় কি রাখা যায়—কখনো-সখনো আলগা হয়ে যায় বইকি!

কথাটা কারও কান এড়ায় নি। যতীন ভাতের থালা থেকে হাত উঠিয়ে তাকালো মলিনার দিকে। সোজাসুজি চোখে তাকালো বাসুদেবও।

ক'টা মুহূর্ত। নিঃশব্দে তিনটি প্রাণী মনের ফেনা মাখলো নিজেদের মনেই; বিমূঢ়, বিব্রত হয়ে। শেষ পর্যন্ত মনের ফেনায় মলিনার চোখের কোণে কেমন করে যে জল এসে পড়লো, করকরিয়ে উঠলো দুই চোখ, কে বলবে, কে জানে!

পাখা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো মলিনা। দালান থেকে ঘরে এসে ঢুকলো। বুকটা অযথাই ধড়ফড় করছে। ব্যথার মোচড়ে বুকের হাড় ক'টাও কনকনিয়ে ওঠে।

বিকেল হতে না হতেই মলিনা ঘর-দোর পরিষ্কার করে উনুন ধরিয়ে দিলে। আনাজের ঝুড়ি নিয়ে কুটনো কুটতে বসলো দালানে। দমকে দমকে ধোঁয়া আসছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে মলিনা। ভিতরে বিছানায় বসে বাসুদেব 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' পড়ছে।

দালান ভরে কটু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো—আর সেই ধোঁয়ার মাঝে বসে থাকলো মলিনা অনেক—অনেকক্ষণ। ধোঁয়া যখন সরে গেল, বাতাসে চোখ মেলে মলিনা দেখে উনুন তার ধরে উঠেছে দাউ

দাউ করে। চোখের জলে মনটাও থিতিয়ে গেছে। মলিনা মরমে মরে যাচ্ছে এখন।

তাড়াতাড়ি চা তৈরি করলে মলিনা। ধবধবে কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো ; 'কই, নিন্, চা নিন্!' হাত বাড়িয়ে দিলে মলিনা।

বই থেকে মুখ তুলে বাসুদেব আনমনা-চোখে তাকালো। 'সদ্গুরু সঙ্গে'র সঙ্গী মন যে নিঃসঙ্গ নয়—এ কথা মনে করতে বাসুদেবের খানিকটা সময় লাগে। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বাসুদেব প্রশ্ন করলে, 'বিকেল হয়ে গেল নাকি?'

—তো কি আপনার আমার জন্যে বসে থাকবে? মৃদু হাসলো মলিনা। শাড়ির আঁচলে 'সদ্গুরুসঙ্গ' ঢেকে নিয়ে বললে, 'চা খেয়ে আমার একটা কাজ করে দিন তো দেখি।'

—কি কাজ? জানতে চায় বাসুদেব।

—একটু বাজার যেতে হবে। মলিনার স্বরে লজ্জা।

—তা বেশ তো।

নিজেকে আরও স্পষ্ট, ব্যক্ত করার আশায় মলিনা বলে, 'আপনার বন্ধু ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার আর যাওয়া হয় না—হাঁড়ি আগলেই বসে থাকতে হবে। রান্নাবান্না শেষ করে রাখি। উনি এলেই আমরা আজ আপনার সঙ্গে আশ্রমে বেড়াতে যাবো।'

একটু হয়তো অবাকই হয়েছিলো বাসুদেব। কিন্তু সবাক হলো যখন, তখন তার গলার সুরে সহজ একটা প্রশ্নই শোনা গেল,

—আশ্রমে যাও নি কখনো?

—একটিবার শুধু। ঠাকুরের আরতি হয় শুনেছি—দেখি নি। আজ চলুন, দেখে আসি। উৎসাহ জানালো মলিনা।

—বেশ তো, চলো।

বেশ খুসিই হয়েছে মলিনা। ওর মুখ দেখে তাই অন্তত মনে

হয়। তাকের ওপর 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' তুলে রেখে মলিনা এবার বললে, 'এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম, যা ভয় হচ্ছিল।'

—কেন ?

—আমি ভাবলাম আপনি বুঝি খু-ব রেগে রয়েছেন—মলিনা নতচোখে বললে হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে, 'তখনকার কথায় রাগ করেন নি তো ?'

বাসুদেব তার অভ্যাস মত নীরবে হাসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মলিনার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়েছে। ক্লান্ত কপালে ফিকে সিঁদুরের টিপ ; আরও যেন কিছু—একটু মমতা, হয়তো বা করুণা। সব মিলে মিশে মনমরা একটি মুখ।—পাগল, রাগ করবো কেন ?

সবেমাত্র গা ধুয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে মলিনা ভব্য হচ্ছে ; ওদিকে সন্ধের আবছা অন্ধকার দালান পেরিয়ে জুড়ে বসছে ঘর ; উঠোনে তুলসী গাছের চারার তলায় প্রদীপটা জ্বলছে তখনও কেঁপে কেঁপে, হঠাৎ দমকা একটা ঝড় এলো যেন।

হুড়মুড় করে সদর দরজা পেরিয়ে যতীন উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিলো, কই গো, শীগ্গির তোমার রান্না সারো।

উঠোনে বেতের মোড়া টেনে বসেছিলো বাসুদেব। মলিনা ঘরে প্রসাধন সারছে তখনও।

—এই যে তুই বাড়িতেই আছিস ? ভালোই হলো। বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে বললে যতীন, 'ভাগ্যিস্ তুই ছিলি, না হলে আচ্ছা এক বিপদে পড়া যেতো।'

স্বামীর ডাক শুনে মলিনা দালানে এসে দাঁড়ালো। স্ত্রীর দিকে এক লহমা তাকিয়ে যতীন বললে, 'চট্ করে তোমার রান্নাটা সেরে নাও তো। দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারা রাত ট্রেনের ধকল সইতে হবে। ভালো কথা, আমার ধোয়ানো কাপড়-চোপড় বাক্সে আছে না কি কিছু ?'

মলিনা অবাক হয়ে স্বামীর পানে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ ধকল সওয়ার কারণ কি ঘটলো। একটু ভয়ই হয়। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে না কি!

—হঠাৎ ট্রেণ? যাবি কোথায়? প্রশ্ন করে বাসুদেব।

—কলকাতা। দ্রুত, উত্তেজনা-ভরা গলায় বলতে থাকে যতীন, 'অফিসে চিঠি এসেছে আমাদের পাঁচ টাকা করে ডিয়ারনেস বেড়েছে এপ্রিল মাস থেকে। গত এপ্রিল থেকে এই এপ্রিল। পাক্কা এক বছর পাঁচটাকা করে পাবো—মানে তোর ষাট্ টাকা। অনিলবাবুকে দিয়ে আজই বিল করিয়ে নিয়েছি। সাহেবও সই করে পাশ করে দিয়েছে। কাল হেড অফিসে পৌঁছে বিলটা দেবো; আমাদের টাকাটি নেবো, আর ব্যস্ রাত্রের ট্রেণে উঠবো। ভাগ্যিস তুই ছিলি, নয়তো কি আর একা ফেলে যাওয়া যেতো!...কই গা, একটু চা খাওয়াবে না? আর হ্যাঁ; কথা বলছো না যে, কাপড়-চোপড় নেই?

—আছে। মলিনা থমথমে গলায় বললে।

ফিরে গিয়ে নিভে আসা উনুনে চায়ের জল চড়াচ্ছে, শুনলো বাসুদেব বলছে, 'দেখ্ তো কাণ্ড। আমি কোথায় ঠিক করে রাখলাম কাল সকালে যাবো, তা তুই সব ভেস্তে দিলি!'

—কাল সকালে তুই যাবি? কোথায় যাবি? যতীন বিস্মিত হয়।

—কোথায় তা কি ঠিক করে রেখেছি? তবে কালই বেরিয়ে পড়বো ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল, প্রায় তিন হপ্তা।

—আরে নে তোর তিন হপ্তা। যাবি যাস না, আমি তোকে আটকাচ্ছি? কালকের দিনটা থেকে যা। পরশু দিন সকালে আমি ফিরে আসছি, তারপর যাস্।

স্বামীর জন্যে চা ঢালতে ঢালতে মলিনা সব শুনলো, প্রত্যেকটি কথা। মনটা তার হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠছে আবার।

যতীনের হাতে চা তুলে দিয়ে মলিনা বললে, বাক্স থেকে কাপড়-জামা কি বেছে নেবে, নাও এসে।

কাপড় জামা বেছে নেওয়ার কিছুই ছিলো না। এ শুধু একটা অজুহাত। যতীন ঘরে এলো। বাক্স খুলে হাঁটু গেড়ে বসলো মলিনা। এক হাতে তুলে ধরলো লণ্ঠন। আলোটা কিন্তু বাক্সের চেয়ে মলিনার মুখকেই বেশি আলোকিত করেছে।

—বা, বেশ দেখাচ্ছে তো তোমায় আজ। স্ত্রীর গম্ভীর অথচ সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বললে।

—দেখাক্, তোমার কি! আমার মুখ দেখবার জন্যে তো আর তুমি বসে থাকবে না। নাও, তাড়াতাড়ি করো, আমার কাজ আছে।

মলিনা যে চটে উঠেছে সে কথা বুঝতে যতীনের দেরি হয় নি। আমতা আমতা করে যতীন অফিসের সব কথা বুঝিয়ে বললে আবার। শেষে মলিনার গাল ধরে বললে, ছি, অবুঝ হয়ো না। গরীব লোক আমরা। যে কটা টাকাই পাই না কেন হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ঘুম হবে না। কত লোকের কত দরকার, এই টাকাটা পেলে কাজে লাগবে সকলেরই।

—তা যাও না কলকাতা, আমি কি বাদ সাধছি! বললে মলিনা অভিমানভরে মুখ সরিয়ে নিয়ে।

বাদ না সাধলেও বাধা দিচ্ছ।

—মোটেই নয়।

—বেশ, তবে বলো তোমার জন্যে কি আনবো কলকাতা থেকে?

—কি আর আনবে! বেশ মোটা দেখে দড়ি কিনে এনো খানিকটা। থমথমে গলায়, চোখে জল ভরে বললে মলিনা, খুব আস্তে আস্তে।

কাজকর্ম সেরে মলিনা যখন ঘরে ঢুকলো রাত তখন খুব বেশি

নয়। তবু এ পাড়াটা নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে গেছে। রোজই যায়। রোজ তবু এ বাড়িটা অন্তত আরও খানিকক্ষণ সজাগ থাকে। কথায়, চীৎকারে, হাসিতে এতটুকু বাড়ি সরগরম করে রাখতে যতীনের জুড়ি নেই। খাওয়া সারতেই তো একঘণ্টা। মলিনার সঙ্গে যতো রাজ্যের অফিসের গল্প করবে যতীন। তারপর বন্ধুদের কথা—কী হয়তো বাড়ির। শুতে এসে দুজনায় কতো যে খুনসুটি তার কি শেষ আছে। বাতি নিভেয়ে বক্‌বকমের শেষ হতে কি-বা এমন কম রাত হয়। আজ সব চুপ। অনেকক্ষণ হলো যতীন চলে গেছে। এতোক্ষণে গাড়িই হয়তো স্টেশন ছেড়ে চলে গেলো।

মুখে দু'চার কুচি সুপুরি পুরে মলিনা দরজা ভেজিয়ে দিলে। একবার শুধু দেখে নিলে বাসুদেব শুয়েছে কি না। না, বাসুদেব এখনো শোয় নি। উঠোনে দড়ির খাটিয়ার ওপর চুপ করে বসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে কি যেন গাইছে। কীর্তনের সুরের মতোই কানে লাগে। চাঁদের আলোয় সারা উঠোন ভেজা। বাসুদেবের চোখ মুখ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। দরজা বন্ধ করে দেয় মলিনা। খিল আঁটে। হঠাৎ কি যেন খেয়াল হয় তার, আবার খিল খোলে। মেঝে থেকে লণ্ঠন তুলে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে থাকে। খিল আঁটে আর খোলে। একটু যেনো নড়বড় করছে খিলটা। বাইরে থেকে ধাক্কা দিলে খিল হয়তো ভেঙেই যাবে। যা ফাঁক দরজায়—পেরেক কী পাতলা লোহার শিক গলিয়েই তো খিল খোলা যায়। মলিনার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। দুর দুর করতে থাকে বুক। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দরজা ভেজিয়ে খিল এঁটে দেয় তাড়াতাড়ি।

এতো ভয় কিসের তার—কে আসবে ঘরে, রাতদুপুরে? মলিনা ভাববার চেষ্টা করে। কে আসবে তা ভাবতে গেলে প্রথমেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে যে—সে ওই উঠোনে বসে। আর কারুর

কথা তো মনের কোণেও উঁকি দেয় না। তবে? এ ভয় বাসুদেবের জন্যে? কিন্তু বাসুদেব—

স্বামীর ওপর ভীষণ রাগ হয় মলিনার। এ কি? বন্ধু, তোমার বন্ধু—আমার কি! পা ফেলতে জায়গা নেই এমন এক ফালি ঘর—সেই ঘরে—দিনের পর দিন বন্ধুকে শুতে, খেতে, বসতে ঠাঁই দাও। কি অসুবিধেই যে হয়। আড়াল আবডাল বলে কিছুই নেই—বাইরের লোকের কাছে নিত্যি ওঠা, বসা, কথা বলা।

বাসুদেবও যেনো কেমন! সেই এসেছে তো এসেইছে; যাবার নামটি করে না। হঠাৎ এলো, যতীনের খোঁজখবর নিয়ে। একই গ্রামে নাকি ওদের বাড়ি, একই সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ। বাড়িতে বাড়িতে জানা-শোনা—দহরম-মহরম। বাসুদেবের মা মারা যাবার পর ঘরে তালা দিয়ে ছেলে বিবাগী হয়ে যায়। আর গ্রামে ফেরে নি। যতীনের বিয়ের কথা কার মুখে যেন শুনেছিলো—ঠিকানা জেনে নিয়েছিলো—তারপর হাজির হয়েছে উটকো ভাবেই।

স্বামীর কাছে কথায় কথায় মলিনা শুনেছে বাসুদেবের নাকি কোন এক ডানা-কাটা পরীর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হয়েছিলো। সব ঠিকঠাক, হঠাৎ বাসুদেবের মা শুনলেন—মেয়েটি বালবিধবা। বাসুদেব জানতো। বিয়ের ইচ্ছেটা তারই। তবু মা গোপন কথাটা জানতে পেরে আঁৎকে উঠলেন। হ'লই বা সুন্দরী—সমাজ, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে সুন্দরী ঘরে আনতে হবে এমন কথা কেউ কি শুনেছ? না—তা হবে না। বাসুদেবের মার দৃঢ় আপত্তি। ওদিকে বাসুদেবেরও গোঁ। হ্যাঁ-না-এর টানা-পোড়েন চলছে এমন সময় হঠাৎ বাসুদেবের মা মারা গেলেন; ছেলেও গৃহত্যাগ করলে।

কি যে ত্যাগ করেছে বাসুদেব—মলিনা তাই ভাবে। কে বলবে ও ঘর ছেড়েছে? এই কি ঘর ছাড়ার লক্ষণ? নিজের ঘর ছেড়েছে বটে কিন্তু জুড়ে বসেছে অপরের ঘর, অপরের ঘরণী।

কথাটা মনে হতেই মলিনার চোখছুটো কপাটের খিলে আঁটকে গেলো। আবার ছুড় ছুরু করতে লাগলো বুক। সত্যি, লোকটা যেন কেমন! প্রথম যে দিন এলো, ওর চেহারা আর কাঁধ-পর্যন্ত চুলের বহর দেখেই মলিনার মন বিষিয়ে গিয়েছিলো। তারপর প্রথম প্রথম সে কি কাছে ঘেঁষার ঘটা। উঠতে বসতে মুচকি-মুচকি হাসা, আস্তে আস্তে ওর নাম ধরে ডাকা—মলিনা, ও মলিনা।···আর এমন ভাবে লোকটা তাকাতো যেনো মলিনা ওর কতো জন্মের চেনা, কতোই না আপন-জন।

প্রথম দর্শনেই যাকে দেখে পিত্তি জ্বলে গিয়েছিলো তার গেরুয়া-বসনের ঘটাপটায় ভেক্‌ভড়ং ছাড়া আর কিছু যে আছে মলিনা তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে নি। আজও পারে না। কেনই-বা না হবে? সবল সুস্থ মানুষ, এ সংসারে তার কোনো কাজ নেই গা? বন্ধুর ঘাড়ে বসে খাবে আর তার বউয়ের দিকে চোরা-চোরা তাকাবে? তাও যদি বন্ধু বড়োলোক হতো। একে তো নিজেদেরই চলে না; আনতে, খেতে, পরতে শুধু নেই নেই, তবু পরের জন্য ধার করো আর মরো।

রাগ শুধু নয়, যতীনের ওপরেও মলিনার মন বিষিয়ে ওঠে। একি! কোথাকার কে—তার জিম্মায় ঘর ছেড়ে, বউ ছেড়ে দিব্যি তুমি চলে গেলে। কিছু যদি একটা হয়!

মাঝরাতে মলিনা হয়তো কখন ঘুমিয়ে পড়বে—আর হঠাৎ যদি দরজা খুলে ওই—!···ভয়ে মলিনার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাম জমতে থাকে ঘাড়ে, কপালে।

হঠাৎ কি মনে হতে মলিনা ইঁদুর-মারা কলটা বেঞ্চির তলা থেকে বের করে নেয়। প্রাণপণে তার তীক্ষ্ণধার কলা ছুটি খোলে। তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিকে ইঁদুর-মারা কলটা দরজার চৌকাঠের ঠিক মাঝখানেই রেখে দেয়।

বাতির শিখা কম করে বিছানায় শুয়ে পড়ে মলিনা। চোখের দৃষ্টি মেলা থাকে দরজার ওপর—আলকাতরা-রাঙানো কালো-কাঠ পুরু একটা যবনিকার মতন ভাসতে থাকে।

কখন যেনো চোখের পাতায় তন্দ্রা নেমেছিলো—হয়তো শেষ রাতেই। কিসের একটা খুট্ করে শব্দ হতে ধড়মড় করে উঠে বসলো মলিনা। কই, কিছু না তো? তবে? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মলিনা অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে উঠোনে চোখ মেলে তাকালো।

ভোর হয়ে আসছে। ফরসা হয়ে গেছে আকাশ। বাসুদেব ঘুমিয়ে।

পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলো মলিনা। বাসুদেব ঘুমোচ্ছে। তার চোখের পাতায় ভোর বেলার প্রগাঢ় ঘুম, ঠোঁটের কোলে একটু মিষ্টি হাসি। হয়তো স্বপ্নই দেখছে। কার স্বপ্ন?···মলিনা হঠাৎ চমকে ওঠে। শিরশিরিয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গ। শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়াতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয়—কাল আশ্রমে বেড়াতে যাবার জন্যে মলিনা যা সাজগোজ করেছিলো এখনো সে সবই তার দেহে। সেই শাড়ি, ব্লাউজ, সেই কুমকুমের টিপ, পায়ের আলতা। এখনো গায়ে সেণ্টের ফিকে গন্ধ।

আশ্চর্য, রাতে শোবার আগে শাড়ি ব্লাউজটাও খুলে রাখে নি? কেন এমন ভুল?

আঁচলটা আঙুলের পাকে জড়াতে জড়াতে মলিনার কেমন যেনো মনটা ফাঁকা হয়ে যায়, বুকের মধ্যে একরাশ বাতাস পাক খেতে থাকে।

তেমনি মন নিয়েই মলিনার সারা দিন কেটে যায়। আনমনা ফাঁকা। টুকটাক কাজ-কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়; পারে না। দুপুরে গরম পড়ে—অসহ্য গরম। মলিনার মনের জ্বালাও মন থেকে দেহে ছড়িয়ে পড়ে। বার দুরেক গা ধুয়ে নেয়। একটু যদি জুড়োয় শরীর।

দুপুরের একটু পর থেকেই মেঘ জমতে থাকে। বিকেলের

গোড়ায় ঘোর হয়ে আসে আকাশ। ধূলো বালির ঘূর্ণি ওঠে, তারপর জল নামে অঝোর ধারায়। ক'দিন ধরে যা গরম পড়েছে তাতে বৃষ্টি হবে এ এমন কিছু আশ্চর্য নয়—কিন্তু এই দেখে মলিনার মুখ আরো কালো হয়ে ওঠে।

আবার রাত। নিস্তব্ধ, নিঝুম হয়ে আসে তালপুকুরের পাড়া। সমানে বৃষ্টি পড়ছে। কখনো ঝিমিয়ে আসে, কখনো জোর হয়ে ওঠে। ছেদ নেই! ছন্নছাড়া এলোমেলো বৃষ্টির ছাট আলুথালু ক'রে মলিনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়; ভিজে জল থৈ থৈ করতে থাকে দালানে। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে যায়।

এমন ভাবনায় আর কখনো পড়েনি মলিনা—সমস্যাটা খুবই কঠিন। তবু সে সমস্যা তেমনি ভাবেই সমাধান করতে হয়—ঠিক যেমন ভাবে বাসুদেবের মা ছেলের বিয়ের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। জলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাক, দালানে দাঁড়িয়ে থাক বাসুদেব, তবু এক ঘরে মলিনার সঙ্গে তার শোয়া চলে না।

মুখ ফুটে বলতে হয় নি মলিনাকে, বাসুদেব নিজেই দালানের একটু কোণ ঘেঁসে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো।

আজ যেনো আরও ভয় করছে মলিনার। আকাশই শুধু কালো নয়, বৃষ্টির জলই শুধু জল নয়, মলিনার মন রাতের প্রতিটি প্রহরে প্রহরে যতো রাজ্যের কালি শুষে শুষে কালো হতে লাগলো; আর চোখের জলে সেই কালো গলে গলে ওর সর্বাঙ্গে কালিমা মাখালে।

কে? কিছু না, বাতাস!···কে যেনো হাঁটছে দালানে; জলে পা পড়ার শব্দ, পা টানার আওয়াজ। কার চোখ বুঝি দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে আছে। কি দেখছে ও? মলিনাকে? অষ্টাদশী মলিনা ভয়ে লজ্জায় আঁট হয়ে থাকে। ধুক্‌ধুক্ করে বুক, হাত-পা কাঁপে, অবশ হয়ে আসে।

কতো রাত এখন? গভীর রাত নিশ্চয়। যতীন নেই। কলকাতায়।

না, কলকাতায় নয়, গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে যতীন। পকেটে টাকা। মলিনা আরও কটা টাকা জমাবে এবার। বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে লুকিয়ে এ ক'মাসে প্রায় গোটা তিরিশেক টাকা জমিয়েছে। এবার যদি আরও কিছু জমায়—ভারী দুটো কানবালা গড়াবে মলিনা। বড় সখ তার। কিম্বা একটা সেই শাড়ি কিনবে—পূর্ণিমার মতন। কিন্তু যতীন যদি তাকে টাকা না দেয়—যদি পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দেয় তার বাবাকে, গলসীতে। না, কখনোই তা হবে না। পাঠিয়ে দেখুক যতীন; যাচ্ছে-তাই ঝগড়া করবে মলিনা এবার। বিয়ে করেছো, কচি খোকাটি নও, তবু বউয়ের জন্য দরদ নেই তোমার। শুধু দুবেলা দুটি ডাল-ভাত আর মিষ্টি কথা? একটা পয়সাও যদি হাতে তুলে দিয়ে থাকে কখনো; একটা কিছু কিনে থাকে নিজে সখ করে। কষ্টেসৃষ্টে যা বাঁচাবার মলিনাকেই বাঁচাতে হয়েছে লুকিয়ে-চুরিয়ে। চুরি? কথাটা মনে হতেই মলিনার বুকটা ধক্ করে ওঠে। চুরি ছাড়া কি? চুরিই বলে একে। যতীন জানে না, মলিনা লুকিয়ে টাকা জমায়; লুকিয়ে এটা ওটা কেনে। হোক না তা দু-চার আনা কী দু এক টাকা। কালও যাবার সময় যতীন চেয়েছে; চেয়েছে র‍্যাশন আনতে, চেয়েছে কলকাতা যাবার সময় দু-চার টাকা ট্রেণে হাত খরচের জন্যে। মলিনা দেয় নি। বলেছে 'টাকা কই, কোথায় পাবো?'

শেষ পর্যন্ত যতীন বাসুদেবের কাছ থেকে কটা টাকা নিয়ে গেছে। বাসুদেব! এই লোকটাকেও আজ তিন হপ্তা ধরে চোব্য-চোষ্য খাওয়াতে হচ্ছে। কোথাকার কে, তার জন্যে গতর দাও, নিজেদের মুখের ভাত তুলে দাও। এক পো দুধ পেলে যতীনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির খানিকটা যেন পূরণ হয়—কিন্তু তার কপালে এক ঝিনুকও দুধ জোটে না, অথচ বাসুদেবের বেলায় দুধ চাই। কেন? কে তার বাসুদেব?

যতীনই বা কে, যতীনের বাবা-মাই বা কে মলিনার? মলিনা

কি তার স্বামীকে দুধ খাওয়াতে পারে না ? একটু ঘি বা একটু বেশি মাছ। কানবালার জমানো টাকা, ব্লাউজের ছিট, পাড়াপড়শীর সঙ্গে মাঝদুপুরে সিনেমা যাওয়া। মাসে এই কটা টাকাও তো বাঁচিয়ে স্বামীর জন্যে ব্যয় করতে পারে মলিনা। শ্বশুর শাশুড়ীর ওপরেই বা এতো রাগ কেন ?

মলিনার মাথা গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে। এমন ভাবে কোনোদিন সে ভাবে নি। এত তার ভয় হয় নি নিজের জন্যে। আজ যেনো সব একে একে খুলে যাচ্ছে—মনের যত গ্লানি, জট। স্বামী তার, স্বামীর সংসার তার, কর্তৃত্ব তার। সব পেয়েছে মলিনা, কিন্তু পেয়েও মন কি তার কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে ? না। স্বামী আর সে ছাড়া আর কিছুই তার সহ্য নয়। আর যা আছে সবই তার চিন্তার গণ্ডী থেকে দূরে।

কে ডাকলো না! মলিনা ধড়মড় করে উঠে বসলো। সম্বিত ফিরে পেয়েছে এতোক্ষণে। কান পেতে শুনলো—বাইরে আবার অঝোর ধারায় জল নেমেছে; আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি। ঘরের বাতিও প্রায় নিবু-নিবু।

কে যেনো দরজায় ঠেলা দিচ্ছে! একটু পরেই আধো-আলো-অন্ধকারে একটা মুখ ভেসে উঠবে। ইঁদুরকলটা পাতা আছে তো দরজার গোড়ায় ? আছে।

বিবর্ণ মুখে বসে থাকে মলিনা দরজায় চোখ রেখে, রুদ্ধ নিশ্বাসে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়—কই, কেউ তো আসে না। কেউ না।

আজও এলো না তা হলে!

জানালা দিয়ে আকাশ দেখলো মলিনা। শ্লেট্-রঙের আকাশ। ভোর হলো এই; বৃষ্টি থেমেছে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে দালানে পা দেয় মলিনা। জলে ভেসে যাচ্ছে দালান। এক কোণে সিক্তবাস সিক্তদেহ বাসুদেব গালে

হাত রেখে চুপ করে বসে আছে। কে যেনো সপাং করে একটা চাবুক কষিয়ে দিলে মলিনাকে। জ্বালা ধরে গেলো সর্বাঙ্গে। হাত পা অসাড় হয়ে এলো ক্ষণেকের জন্যে। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে যে লোকটা পাথরের মত বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মলিনার মনে হলো—বড্ড ছোট ঘরে ও বাস করে, বড্ড ছোট মন নিয়ে। নোংরা মন। ইঁদুর কি!

বাসুদেবের পাশে এসে মলিনা ডাকে, 'একি? এমনি ভাবে বসে আছেন সারা রাত?'

বাসুদেব চোখ তুলে তাকায়। চোখ দুটো তার জবা ফুলের মত লাল। বাসুদেবের হাত ধরে মলিনা।

• —ছি ছি। আপনি কি বলুন তো! সারা রাত এ ভাবে বসে থাকলেন? একবার তো ডাকতে হয়। আমিও মরণ ঘুম ঘুমিয়েছি।

বাসুদেব তেমনি ভাবেই তাকায়। মলিনার চোখে মুখে কোথাও কি ঘুম লেগে আছে?

—গাটাও খুব গরম মনে হচ্ছে! উঠুন। আসুন আমার সঙ্গে। মলিনা বাসুদেবের হাত ধরে টানে।

সেদিনই মাঝরাতে যতীনের পাশ থেকে উঠে মলিনা দরজার খিল খুলতে গেল নিঃশব্দে। কে জানতো, আজও দরজার গোড়ায় ইঁদুরকল পাতা আছে। মনেও পড়ে নি ঘুণাক্ষরে মলিনার। ইঁদুর কলে পা পড়লো ওর। করাতের দাঁত কামড়ে ধরছে মলিনার পা। কঠিন কামড়। পায়ের পাতা যেন থেঁৎলে গেল। কী তীব্র যন্ত্রণা! ককিয়ে উঠলো মলিনা। যতীন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই।

কেমন করে যে মলিনা বাতি জ্বেলেছে; অসহ্য যন্ত্রণা সম্বরণ করেছে দাঁতে দাঁত চেপে, কেউ তা জানতে পারলো না।

পরের দিন একটু বেলায় গম্ভীর মুখে যতীন একটা রিক্সা ডেকে আনলো। গায়ের মোটা চাদরটা জড়িয়ে কাঁধের থলে কাঁধে ফেলে বাসুদেব বললে, 'আসি রে! বেশ কাটলো ক'দিন। আবার আসবো কখনো।'

—খবরদার! এ বাড়িতে জীবনে আর পা দিবি নে, তোর গুরুর দিব্যি! আমি তোর কে?

—বন্ধু। ম্লান হেসে বলে বাসুদেব।

—থাক্-থাক্ শালা, আর বাক-ফট্টাই করিস্ নে। অনেক ভড়ং দেখলাম। গা ভর্তি জ্বর। বাড়ি ছেড়ে চললেন উনি। কেনো রে? এতদিন কাটলো, আর কটা দিন তোর এখানে কাটতো না?

—রাগ করিস কেনো? আমার হয়তো বসন্ত হবে। তোদের বাড়িতে বিষ ছড়াবো। তাই। একটু থামলো বাসুদেব তারপর বললে আবার, 'যাই দেওঘরের গাড়ি চলে গেলে ফেরে আসতে হবে।'

—দেওঘরে যাচ্ছো? যাও—! ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে তাকালো যতীন, 'কোথায় উঠবে? সেই আশ্রমে তো! যদি না উঠতে দেয়?

—পাগল, তিনি আমার গুরু। আচ্ছা আসি। মলিনা কই —ঘরে? থাক্ থাক্, আসতে হবে না। চললুম—আবার আসবো।

বাসুদেব গিয়ে রিক্সায় উঠলো। বড় রাস্তা পর্যন্ত বাসুদেবকে এগিয়ে দিয়ে যতীন ফিরে এলো। উঠোনে, দালানে কোথাও মলিনা নেই।

ঘরে ঢুকে যতীন দেখে মলিনা জানালার কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

—কি গো, কি হলো, দাঁড়িয়ে যে?

স্বামীর গলার স্বরে মুখ ফেরালো মলিনা। চোখ দুটো তার লাল; ছল ছল করছে।

অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতীন বলে, 'কি ব্যাপার কাঁদছো নাকি ?'

মলিনার খেয়াল হয়। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলে, 'পাটায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।'

মলিনার পায়ের দিকে যতীনের এই প্রথম নজর গেলো। ছেঁড়া কাপড়ে মলিনার পা জড়ানো। বেশ ফুলেছে। কি হয়েছে জানতে চায় যতীন।

মলিনা বলে, ইঁদুর কলে কেটে গেছে।

নিমেষে যতীনের মেজাজ চড়ে যায়।

—কোথায় সেই সর্বনেশে যন্তরটা ? আজ আমি ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করবো।

খাটের তলায় ইঁদুরকল খুঁজতে বসে যতীন।

স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মলিনা ধীরে ধীরে বলে, 'খাটের তলায় নেই।'

—কোথায় তবে ?

—ফেলে দিয়েছি জানালা দিয়ে।

চমক্ লাগে যতীনের। দাঁড়িয়ে উঠে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'সত্যি ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মলিনা। বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

—তা হলে তোমার ইঁদুর—? স্ত্রীর অবোধ্য চোখে চোখ রেখে যতীন থতমত খেয়ে বলে।

স্বামীর কথার জবাব দেয় না মলিনা। মনে মনে ভাবে ঃ ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই—ঘরেই রয়েছে। কুরকুর করে কাটছে দিনরাত—কতো যে ক্ষতি করেছে তার কি লেখা-জোখা আছে—না থাকবে কোনও দিন। আরও কতো হয়তো করবে। কিন্তু যতীন একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, এই তার ভাগ্যি।

রাজপুত্র

রাজার ছেলে রাজা হয়, এক্কাঅলার ছেলে এক্কাঅলা।

ঝরিয়া বাজারের এক্কাঅলা রাজারামের ছেলে পিয়ারী কিন্তু বাপের সিংহাসন বাতিল করল। খটখটে কাঠের তক্তা তার ভাল লাগে নি, পছন্দও হয় নি। রাজারামের রাজদণ্ড যা সেটা নেহাতই একটা লিকলিকে ছপটি, তাতে ঘোড়া ছোটে কিন্তু মন ছোটে না। আর ঘাস-বিচালি দানা-পানির সঙ্গে শালা ময়লা জানোয়ারের ল্যাজের ঝাপটা বায়ুর গন্ধ নাক জ্বালিয়ে দেয়, বমি আসে, মুখ একেবারে যেন বালি দিয়ে রগড়ে দেয়।

তারপর আরও আছে, দু আনা তিন আনার সওয়ারীর জন্যে গাড়ি নিয়ে ফ্যা ফ্যা। ট্রাফিক পুলিসকে ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডবৎ, পানের পয়সা গুঁজে দেওয়া।

যখন বারো তেরো বছর বয়স মাত্র, তখন কখনও বাপের সঙ্গে, কখনও বা খুব বীরত্ব ক'রে একাই অল্প ফাঁকা রাস্তায় সে গাড়ি ছুটিয়েছে দু-দশ দিন। একদিন এক সাহেবের মোটর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে দু গালে দু থাপ্পড় আর পেছনে এক লাথি খেয়েছিল, আর একবার ফুস বাঙলোর কাছে রেল লাইনের কাছাকাছি ঢালুটায় নামতে গিয়ে এক্কা উল্‌টে দিয়েছিল। ভাগা ষ্টেশনের কাছে ছোট এক বাচ্চাকে প্রায় চাপা দিয়ে থানাতেও গিয়েছিল একবার। তখন থেকেই, কি তার আগে থেকেই ওই শালা জানোয়ারে টানা গাড়ির ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা।

পিয়ারী সেই থেকে আর ঘোড়ার লাগাম ধরে নি; ধরবে না জীবনে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। ও চাইলে কিংবা ওর বাবার মর্জি হ'লে ঝরিয়া বাজারের ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে কালীবাবু, সুরথ, শোভন মিস্ত্রি

এদের কারু ট্যাক্সিতে লেগে থেকে ছুটো কাজ করতে পারত, পরে যাকে বলত ক্লীনাস (ক্লীনার্স)। ক্লীনার্স থেকে আস্তে আস্তে এটা ওটা—ষ্টার্ট মারা, ব্রেক খোলা, দু-দশ পা গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ব্যাক করা—ফুকো ড্রাইভারী, তারপর আসল ড্রাইভারী একদিন। সবই হত, বাপের যদি মতি বা মর্জি থাকত। রাজারামের মতি অন্য রকম, এক্কার তক্তায় বসে ছপটি ধরে তার সারা জীবনটাই কেটে গেল—আর ছেলে পিয়ারী মোটর ড্রাইভারী ক'রে লাট হবে।

তাও যদি লাট হওয়া যেত। তুই গাধার বাচ্চা, বেকুফ কাঁহাকার —ড্রাইভারী শিখে করবি কি ? তোর কখনও এক-দো হাজার রুপেয়া হবে যে একটা সিকিণ্ড হাণ্ড টাক্‌সি ভি মোলতে পারবি ? তব— ?

পিয়ারী হুঁ হাঁ কিছু না বলে—পরে একদিন পিটটান দিল। তার বাবার এক্কা যে-সীমানায় যায় না সেখানে। অনেকটা দূরে। কোলিয়ারীর বাঙালী সাহেবদের বাংলোয় চাকর হয়ে ঢুকলো। এখান ওখান করে শুরু করল। সাহেবদের গাড়ির ওপর তার চোখ, ডিম কি একটিন সিগারেট কিনতে সাইকেল ঠেলে এখান ওখান ছোটো বা মেমসাহেবদের ধোয়া কাপড় জামার জন্যে এরারুটের মাড় মেশাও বালতিতে কিংবা নীল—চিট্‌ নিয়ে অন্য বাঙলোয় যাও, কলাগাছ থেকে ক'টা কাঁচা কলা পেড়ে আনো—এ-সবের জন্যে পিয়ারী চাকরি করতে আসে নি।

ছিট্‌কোতে ছট্‌কাতে চৌধুরী সাহেবের বাংলো থেকে বোস সাহেব, সেখান থেকে পার্শী সাহেব—শেষে চৌধুরী সাহেবের বাংলোয় এসে কিছুদিন লেগে থাকবার পর ও গাড়ি ধুতে, কারবুরেটারে জল দিতে, মোবিল আর পেট্রল ঢালতে পারল। চৌধুরী সাহেবের ড্রাইভার ছিল না ; সাহেব নিজে গাড়ি চালাতেন, পিয়ারী তাঁর পাশে কি পিছনের সিটে থাকবার সুযোগ পেল। সাহেব অফিস যাবার সময় পিয়ারীকে নিতেন না। কিন্তু বিকেলে কোথাও একটু দূরে

যেতে হ'লে পিয়ারীকে সঙ্গে নিতেন। সাহেব যখন ঝরিয়া বাজারে যেতেন পিয়ারীর বুক ধুক ধুক করত। যতটা পারে সে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখত। একদিন ফিরতি পথে তার বাবার একাকে যখন চৌধুরী সাহেব সাঁই ক'রে পাশ কাটিয়ে একরাশ কালচে ধুলো পিছু ছুঁড়ে অন্ধকার ক'রে চলে গেল—তখন পিয়ারীর প্রথমটায় একটু খারাপ লাগলেও পরে মনে বেশ একটা জব্দ করার মতন আনন্দ হয়েছিল। ঠ্যাং খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে তুমি ধুলোর ঝাপটাই খাবে। বোকা, বোকা বুঢ্ঢা কাঁহাকার।

পরের বার ঝরিয়া বাজারে বাপের হাতে ধরা পড়ে গেল পিয়ারী। সাহেবের কতকগুলো সওদা নিয়ে সে গাড়িতে আসছিল—প্যাটেলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রাজারাম তখন, একায় একটি মাত্র সওয়ারী চাপিয়ে হাঁকছে - ভাওড়া, ভাওড়া—ফুস বাংলা—, হঠাৎ একেবারে বাপ-ছেলে মুখোমুখি হয়ে পড়ল।

বোধ হয় কয়েক পলক ছেলের দিকে—ছেলের চোখ, মুখ, হাফ প্যাণ্ট আর কামিজের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজারাম একার ওপর বসেই বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে পিয়ারীকে অভ্যর্থনা করল। নামল না একা থেকে—তবে একটু উঁচু হয়ে হাতের ছপটি প্রায় বসায় আর কি এমন ভঙ্গিতে স্থির থেকে যা বলল, তার অর্থ, হারামির বাচ্চা কালা প্যাণ্ট পরেছে; কামিজ ভি কা বাহারী! নোকার বনা হুয়ে হও না কিয়া বে, উল্লু! খান্‌সা-মা?

প্রথম চোট কাটার পর একাটাকে রাস্তায় একটু ঠেলে রেখে রাজারাম ছেলের কাছে এসে দাঁড়াল। পিয়ারী যে মরবে না রাজারাম জানত। খবর নেবার গরজও তার ছিল না। তবে হাঁ, রাজারাম শুনেছে আগেই, সাহেব বাড়ীতে ছেলে তার খাটছে। কি করিস তুই? কত টাকা মাইনে পাস? তলবের টাকা কোথায় রাখিস?

পিয়ারী প্রথমটায় ভীষণ রেগে উঠলেও পরে কথায় কথায় অতটা চোট দেখাতে পারল না। সব কথা বলল একে একে।

রাজারাম খুশি না অখুশি ঠিক যে কী হ'ল ভাল বোঝা গেল না। বললে, ঘার না আওগে ?

মাথা নাড়ল পিয়ারী। যাবে।

'কব্ !'

'আগলি মাহিনেকো এতোয়ারমে।'

আগামী মাসের শুরুই বা কবে—আর কোন রবিবারে ছেলে আসবে বাড়ী রাজারাম তার খোঁজ করল না। তার এক্কার দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল, তোর মা-র হাত পুড়ে গেছে, দাওয়াই লাগিয়ে বসে আছে আর চেল্লাচ্ছে।

তারপর থেকে মাঝে মধ্যে পিয়ারী বাপ-মার খোঁজখবর নিতে বাড়ী যেত। চৌধুরী সাহেবের চাকরি সে ছাড়ল না। রাজারামও আর এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে অযথা ঝগড়াঝাটি করল না। রাজারাম বুঝতে পেরেছিল, এক্কাঅলার ছেলে এক্কাঅলা আর হয় না আজকাল। এ সব ছেলেদের মেজাজমর্জি আলাদা। তারা কেউ কোলিয়ারীর কোথাও একটা কিছুতে ঢুকে পড়ে, কেউ সিনেমার সামনে রেশমী রুমাল ফিরি করে আর কেউ পকেট মারে, কেউ বা সাইকেলের দোকানে চাকরি। রাজারাম এ-সব সহ্য করতে পারে, শুধু পারে না মনোহারের মতন ছেলেদের, যারা চকচকে চুলে আমলা তেলের গন্ধ ছুটিয়ে, পাঁচ দশ খিলি পানে ঠোঁট আর অর্ধেক মুখ লাল ক'রে দারুর নেশায় চোখ ভাজা ডিমের মতন গরগর ক'রে পানের দোকান, ল্যাংড়ার চায়ের দোকান আর ট্যাক্‌সি ষ্ট্যাণ্ডের একটু ওপাশে এক তুলো ধুনুরার আস্তানায় নানারকম জাল জালিয়াতির ফন্দি আঁটে।

পিয়ারীকে ঝরিয়া বাজারে আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায় মনোহারের সঙ্গে।

দেখা হ'লে রাজারাম শুধিয়েছে, 'কি বে লাটের বাচ্চা, নোকরি ছেড়ে দিয়েছিস না কি? হরবখত আজকাল তোকে ঝরিয়া বাজারে দেখি?'

চাকরি ছাড়া দূরের কথা পিয়ারীর এখন পোয়াবারো অবস্থা। সাহেবের গাড়ি মেরামত হচ্ছে। আজ ব্যাটারী, কাল প্লাগ, পরশু তামা, পরের দিন বেল্ট—হয় নিতে কিংবা পালটাতে প্রায় রোজই ঝরিয়া বাজারে আসতে হয় পিয়ারীকে। আর এই ফাঁকে পিয়ারীর মোটর গাড়ির নানা কলকব্জা, তাদের যাদু একটু জানা হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে মধু ড্রাইভারের সঙ্গে খাতিরও সে জমিয়ে নিয়েছে খুব। গাড়ি সারতে বসে মধু যত না তেলকালি ঘাঁটে—পিয়ারী তার চতুর্গুণ। পিয়ারীর তাতে উৎসাহ নেভে না। বরং মধু যত বলে এটা টাইট মার, ওটা মোছ, ততই খুশি হয়ে ওঠে পিয়ারী; মধুকে ঘন ঘন বিড়ি খাওয়ায়, মাঝে মধ্যে পাসিংসো সিগারেট।

গাড়ি মেরামত হয় আর ট্রায়াল চলে। মধুর পাশে পিয়ারী। এটা ক্লাচ, ওটা গীয়ার, ব্রেক আর পা খুব হুঁসিয়ারীতে রাখতে হবে বুঝলি না; ছুটলেই একেবারে তিন নম্বর খাদে চলে যাবি—।

হাতে খড়ি হ'ল, কিন্তু তার বেশি আর এগুতে পারল না পিয়ারী। তার হাতে কে গাড়ি ছেড়ে দেবে ভরসা ক'রে?

মধু ছিল কোম্পানীর ড্রাইভার। পিয়ারী তার হাতে পায়ে ধরল। যদি কোনও রকমে ড্রাইভারী বা হেল্পার গোছের একটা কিছু ক'রে তাকে ঢোকাতে পারে।

মধু বললে, কি করবি তুই কোম্পানির চাকরি ক'রে? এখানে শালা নোকরিতে ঢুকলে তোর পেটও ভরবে না, আখেরও যাবে।

'তব কারে কিয়া?' পিয়ারী হতাশ হয়ে শুধোয়।

'শোন ; এক কাজ কর।' মধু উপদেশ দেয়, 'ঝরিয়া-ধানবাদ বাজারে আজকাল ভট্‌ভটিয়া এসেছে দু-একটা। কোনগতিকে তাই একটা কিনে নে। নয়া চালু হয়েছে। বউ পোষার চেয়েও কম খরচ। এক গ্যালন তেলে আশি মাইল চলবে। দু'দিনে তুই শালা রাজা হয়ে যাবি।'

উপদেশের আপাত চেহারাটা ভাল। মাস খানেক হ'ল ঝরিয়া-ধানবাদ বাজারে এক ধরনের নতুন গাড়ি চালু হয়েছে। বাচ্চা বাচ্চা ভট্‌ভটিয়া গাড়ির সঙ্গে গদি আঁটা রিকসা জোড়া। বেশ বাহারী দেখতে। দু-জন ক'রে সওয়ারী নেওয়া যায়। তেজী আছে খুব। দশ বার মিনিটে ধানবাদ পৌঁছে দেয়। পিয়ারী দেখেছে বাজারে এই গাড়ি। কিন্তু ও-গাড়ির দাম কত? যতই কম হোক— পিয়ারী তা কিনতে তো পারবে না।

মধু বলে, কোনও ফিকিরে তুই পাঁচশো টাকা যোগাড় কর পিয়ারী। ধানবাদ মোটর এজেন্সীতে ও-গাড়ি আছে। বিশ্বাসবাবুর সঙ্গে আমার দশ বছরের জানাশোনা। আমি তোকে কিনিয়ে দেব। তারপর মাসে মাসে দেনা দিবি।

পাঁচশো! পিয়ারীর কাছে পাঁচশো টাকা মনের একটা নকল স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। পঞ্চাশ টাকা হ'লে ও পারে। তলবের বেশির ভাগ টাকাটাই মেমসাহেবের কাছে রেখে দিয়েছে পিয়ারী। তা এতোদিনে টাকা ষাট জমেছে।

হতাশ হয় পিয়ারী। 'পাঁচ শ' রূপেয়া কাঁহা মিলেগা, মধু ভাইয়া!"

'নেহি মিলেগা তো বেকার রোও মাত।' মধু বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়। পিয়ারীর এই ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান তার ভাল লাগে না। শালা এক্কাঅলার বাচ্চার সাধ আছে ষোল আনা, মুরদ নেই কানা কড়িরও।

পাঁচশো টাকা পিয়ারীর কাছে স্বপ্ন হতে পারে কিন্তু অটো-রিক্‌শার চমককে কিছুতেই চোখ থেকে আর মুছতে পারছিল না বেচারী। ঝরিয়া বাজারে হর্ন মারতে মারতে নীল বডির 'তুফানী' যখন এসে দাঁড়ায় পিয়ারী যেন চোখ দিয়ে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিনাটি চাটে। মোটরবাইকের হ্যাণ্ডেলের মতন হ্যাণ্ডেল, মাথায় হেড লাইট, পায়ের তলায় ষ্টার্টার, গীয়ার, ব্রেক—কি নেই। পিছুতে জোড়া রিক্‌শা খানাও খাসা। ছোট কিন্তু ঝকঝকে। মাথায় হুড। খোলা গদী। রিক্‌শার পিছুতে নাম লিখিয়ে নিয়েছে তার মালিক, 'তুফানী'।

'তুফানী'র মালিক কানাই। কানাই এখন গাড়ি চলায় প্যাণ্ট আর হলুদ কলার তোলা গেঞ্জি পরে। চোখে নীল চশমা। এই কানাই গত বছরেও আলু বিক্রী করত বাজারের বাইরে বসে।

এত টাকা কানাই কোথায় পেল ?

অন্য গাড়িটা যার পিয়ারী তাকে চেনে না। এ শহরে হয়তো সে নতুন। তার গাড়ির নাম নেই। কিন্তু সেটাও খুব বাহারী।

পিয়ারী এই গাড়িগুলোও দেখে—সেই সঙ্গে তার বাবা রাজারামের একা, ওই রকম আর আর একাগুলোও। একটা কাঠের কোনও গতিক খাঁচা, ছুটো চাকা আর শালা ধুঁকে পড়া একটা ঘোড়া। ঝরিয়া বাজারে তাড়া খেয়ে খেয়ে, গালি গালাজ শুনে নির্বিকারে রাস্তা জাম ক'রে ঘুরছে আর যত চুতিয়া সওয়ারী ওঠাচ্ছে। ও দিকে তাকালে ঘৃণায়, রাগে পিয়ারীর উনিশ বছরের জোয়ান চেহারাটা কাঠের মতন শক্ত হয়ে যায়।

রাজারামের সঙ্গে দেখা হ'লে রাজা সুধোয় কি বে লাটের বাচ্চা,—তোর সাহেবের গাড়ি কি কারখানায় হাওয়া খাচ্ছে? বাজারে তুই রোজ আসিস্ কেন ?'

'কাম মে আগ্যয়া।' পিয়ারী বাপের দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকায়।

'কিয়া কাম ?'

কথার জবাব দেয় না পিয়ারী। রাজারাম বলে, কটু গলায়, 'মনোহারসে তুমকো ইতনা দোস্তি ল্যাগা হয় কৈসে রে ?'

মনোহরের সঙ্গে অতখানি দহরম-মহরম করার কারণটা রাজারামকে বলা যায় না। তবে পিয়ারীর একটু ভয় ভয় হয়। রাজারাম একাঅলা হ'লেও, বেজায় ধার্মিক। রামসীতার পূজো করে বুড়ো বাড়ীতে। বড্ড সত্যবাদী, সরল।

'কোহি ফিকিরসে না ; অ্যায়সা।—' পিয়ারী কথাটা ধামা চাপা দিতে চায় তাড়াতাড়ি।

রাজারাম ছেলেমানুষ নয়। ছেলেকে সাবধান ক'রে দিয়ে ও বলে, 'আগর জেলকো ফাটক্ না দেখনে মাঙ্গতা তো হুঁশিয়ারী মে রহনা উল্লু।'

জেলের ফাটক পিয়ারী দেখবে না। তার সত্তর টাকা জমেছে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে। মেমসাহেবের কাছে আছে। আর এই ক' দিনে নিজের লুকানো তহবিলে বিশ টাকা। পাঁচশো টাকা হতে কতদিন লাগবে কে জানে। তবে মনোহর তাকে যে পথ বাতলে দিয়েছে—তাতে এই শীতের আগে প্রায় কাছাকাছি হবে পাঁচশোর।

পিয়ারী পাঁচশো টাকা করবেই। ভট্‌ভটিয়া সে কিনবেই। আর রাজারামের চোখের সামনে সে হর্ন মেরে ধুলো উড়িয়ে যাবেই যাবে।

এদিকে দেখতে দেখতে ঝরিয়া বাজারে অটো-রিক্‌শা বাড়তে লাগল। তিন মাসের মধ্যে ছ'খানা হয়ে গেল। বাজার যেন মাত ক'রে দিয়েছে। ধানবাদ যাবে—বোম্বে মেল ধরতে ? একলা যদি বস দেড় টাকা। আর এক সওয়ারী যদি নিতে দাও বারো আনা। সিনেমায় যাবে—কাজে যাবে—তুরন্ত পৌঁছে দেব। কোলিয়ারীর বাবুরা যাদের একা চড়লে সম্মানে লাগে, ট্যাক্সি করার পয়সা নেই,

সেভেনসিটার পেলেও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে—তারা ঝপাঝপ অটো রিক্‌শা নিয়ে নেয়। ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে উড়ে যায়।

পিয়ারী হাত কামড়ায়। আ শালা কানাই, গোবিন্দ, রাম, ইয়াসিন—কী পয়সাই লুটছে। ওরা আজকাল সারাদিন খেটে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে, বেলফুলের মালা কেনে—রাবড়ি খায়, মদ খায়, রাজপুকুরের দিকে বেশ্যাবাড়ীতে যায়।

আর পিয়ারী? পিয়ারীর মাত্র দেড়শ' টাকা হ'ল এতদিনে। সাহেব আজকাল চালাক হয়ে গেছে। পেট্রল থেকে সুরু ক'রে—গাড়ির টুকটাক সহজে কিছু আর চুরি করার উপায় নেই। পিয়ারী যে কি করবে কিছু ভেবে পায় না। রাজারাম যদি এক্কা ঘোড়া সব বিক্রী ক'রে দিত—শত দেড়েক টাকা হত হয়তো। তা সে দেবে না। কথাটা শুনলে হয়তো বুড়ো পিয়ারীকে খুন ক'রে ফেলবে। ভরসা ক'রে কোনদিনই পিয়ারী তাই কথাটা বলতে পারল না।

নতুন নতুন অটো-রিক্‌শাগুলো দেখত পিয়ারী আর নিশ্বাস ফেলত, ছটফট করত, ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরত। সব এরা ছজনে মিলে লুটে নিচ্ছে। এরপর আরও বাড়বে রিক্‌শা। এখন আবার মোটর গাড়ির বডি দেওয়া তিনচাকার গাড়িও আসতে শুরু ক'রে দিয়েছে। কবে আর পিয়ারী পয়সা কমাবে! কবে?

শীতের ঠিক আগে আগেই, কী কপাল পিয়ারীর, টাকাটা হয়ে গেল। অবশ্য ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিল পিয়ারী জেলের ফটকে ঢুকতেও পারত যদি সাহেব অতটা ভাল মানুষ না হতেন। পিয়ারীকে কেউ সন্দেহ করে নি। মেমসাহেব হয়তো করতেন, ক'রেও ছিলেন একটু—সাহেব একেবারে হেসেই যেন ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।

মেমসাহেবের কাছে তার জমানো টাকা, নিজের লুকোনো গচ্ছিত

আর সোনা বিক্রির টাকা সব মিলিয়ে মোটামুটি যা হ'ল তা পাঁচশোর কিছু বেশি।

পিয়ারী অটো-রিক্শা কিনে ফেলল। মধু ড্রাইভারের সুপারিশ আর দরকার হয়নি। প্রথম কিস্তির টাকা দিলেই গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর মাস মাস কিস্তি। ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ির মালিক তুমি নও, কাপুরচাঁদবাবু।

রাজারামের ধোঁকা লাগল। সন্দেহও পুরোপুরি। ছেলেকে এককথা শতবার ক'রে জিজ্ঞেস করে। 'হারামের টাকাতে পেট বেশিদিন ভরে না, পিয়ারী। এত টাকা তুই কোথায় পেলি! চুরি করেছিস।'

পিয়ারী মাথা নাড়ে। মেজাজ গরম করে। ঝগড়াও বেধে গেল একদিন।

'আগর চোরি কিয়া তো ভি তোমহারা কিয়া!' বেশ করেছি। জেল যেতে হয় যাব। তা ব'লে তোমার মতন হাড়হদ্দ টাঙ্গা টেনে টেনে আমার জীবন আমি বরবাদ করব না।

ছেলের পিঠে ঘোড়ার ঘাসের বস্তাটা ছুঁড়ে মারল রাজারাম প্রথমে। তারপর ভাঙা বালতি নিয়ে তেড়ে এল। শুয়ারকে বাচ্চেকো মেরেই ফেলবে। পিয়ারীও হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। বাপ-বেটায় রক্তারক্তি কাণ্ড করে আর কি! রাজারামের বউ ডাকছেড়ে কেঁদে উঠল। লোকজন ছুটে এসে গণ্ডগোলটা মেটায় শেষে।

সেই থেকে পিয়ারী বাপ ছাড়ল—বাড়ীও ছাড়ল। চুলোয় যাক অমন বাপ! বাড়ীতেও তার 'দরকার নেই। বাচ্চা বয়সে একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—সে মেয়েটাও কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। পিয়ারীর তাকে মনেও পড়ে না।

রাজারামের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে পিয়ারী ঝরিয়ার হাটের

দিকে পরমেশ্বর, গোপাল ওদের আস্তানায় চলে গেল। পরমেশ্বরের ঝকঝকে পানবিড়ি সিগারেটের দোকান—আর গোপালের ফলের ব্যবসা।

তার গাড়ির নাম দিয়েছে পিয়ারী 'পবন'। শুধু নামই দেয়নি, পবনের স্পর্শটা সে লাগাবারও চেষ্টা করে তার অটো-রিকশায়। সওয়ারী নিয়ে উঠলে আর গাড়ি একবার খুললে তার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। হাওয়ার বেগে উড়িয়ে দেয় গাড়ি। অত হাল্কা, পিছনের রিকশার যে মাত্র দুটি চাকা—কিছুই আর খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকে না, যেকোনো সময়ে একটু এদিক ওদিক হ'লে গাড়ি টাল খেয়ে উল্টে পড়বে, রাস্তায় লোক জখম হবে চাই কি সওয়ারী বা নিজেও ভয়ংকর চোট খেতে পারে। না কিছু তার খেয়াল থাকে না। এতটুকু বুক কাঁপে না বাজারের ওই ভিড়ের মধ্য দিয়ে হর্ন আর ব্রেক মারতে মারতে মানুষ, গরু, মোষ পাশ কাটিয়ে ধাক্কা মারতে গিয়েও কী আশ্চর্য কায়দায় বিপদটা বাঁচিয়ে গাড়ি নিয়ে ছুটে যেতে। রাজ-ময়দানের ওপরে ওঠার সময়, ঢালু নামার সময়ও পিয়ারী নির্ভয়—বেপরোয়া।

পিয়ারীর জীবন যেন এই গাড়ির জন্যে এতদিন চুপ ক'রে অপেক্ষা করছিল। বাস্তবিক, আগে, মাত্র একমাস আগেও পিয়ারীকে দেখলে ভাবাও যেত না, এই ছোকরা তার শরীরের মধ্যে এতখানি উত্তেজনা, নির্ভয়, তাপ আর দুরন্ত এক তৃষ্ণা লুকিয়ে রেখেছিল। সারা জীবনের সাধ আর কামনা—'পবনে'র শিংয়ের মতো দুটি হ্যাণ্ডেল, ব্রেক আর গীয়ার আর পেট্রলের গন্ধ পেয়ে—এবার পিয়ারীর ভেতরের সমস্ত দুঃসাহস আগুনের মতন জ্বলে উঠেছে।

তবু প্রথম প্রথম একট ভয়ডর—হাতের এলোমেলো ভাবটা ছিল—মাস দুয়েকের মধ্যেই পিয়ারী একেবারে পাকা ড্রাইভার;

তার হাত যেন হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে চেপে থাকত, ব্রেক একেবারে চোখের সঙ্গে লাগানো।

'পবন' যখন ঝরিয়া বাজার থেকে বেরিয়ে রাজ বাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে চলত ধানবাদের দিকে পিচের মসৃণ রাস্তা দিয়ে সে এক দেখার দৃশ্য। যেন একটা লাল রঙের হরিণ দৌড় দিয়েছে, গায়ে সাদার ডোরা। তার গতি সরল নয়, এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে হাওয়ার মতন।

হাওয়ায় পিয়ারীর পাজামা পত পত ক'রে কাঁপত, শার্টের কলার উড়ন্ত, পেটের কাছ থেকে জামাটা লেপ্টে গিয়ে পকেট দুটো ফর ফর করত। আর এক মাথা চুল আলুথালু হয়ে যেত।

'ওতনা স্পীড মে মাত হাঁকানা রে পিয়ারী—শালে কোই দিন বাস্‌কো চাক্কেকো আন্দর খাতম হো যায়গা।' পিয়ারীকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলত সুরেশ।

'হ্যাট বে হ্যাট। ইয়ে তোমারি 'আশা' হ্যায়?'

তা ঠিক। সুরেশের 'আশা' গাড়িটা দু-হাত ফেরাই। তার অবস্থা ঝড়ঝড়ে। সুরেশ তার গায়ে হাত বুলিয়ে যে কদিন পারে চালাচ্ছে। পিয়ারীর 'পবনে'র দিকে তাকিয়ে সুরেশ দুঃখের হাসি হাসে।

রাজারামেব সঙ্গে পথে ঘাটে ঝরিয়া বাজারে চোখাচুখি হয় পিয়াবীব। কিন্তু বাপ ছেলে কেউ কারুর দিকে দু-দণ্ড তাকিয়ে থাকে না। চোখ ফিরিয়ে নেয়। কথা বলে না। ঠোঁটের কোণে পবস্পরের প্রতি অভিশাপ আর রাগ যেন কঠিন হয়ে দানা বেঁধে যায়।

রাস্তায় যদি কোনোদিন পিয়ারী দেখে রাজারামের গাড়ি আগে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী তার গাড়িকে এক লাফে তিরিশ মাইলে উঠিয়ে রাজারামের পিছু থেকে তীব্র হর্ন মারতে মারতে ঝড়ের

বেগে পাশ কাটিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে যাবে। যেন এই যাওয়া দিয়ে বলে যায়, বুড়ো পাথর কাঁহাকার— দেখ্—আমি কোথায় আর তুই কোথায়।

রাজারামও প্রতিশোধ নিতে জানে। কোনোদিন যদি একটু ভিড়ের মধ্যে পিছুতে হর্ন শুনে চিনে ফেলেছে পিয়ারীর গাড়ি, তবে আর রক্ষে নেই—যতক্ষণ পারবে যেমন ক'রে পারবে রাস্তা বন্ধ ক'রে পিছুতে ফেলে রাখতে চাইবে।

ঝরিয়া বাজারের সকলে বাপ-বেটার এই সাজ্ঘাতিক বিশ্রী রেষারেষি দেখে। কেউ হাসে, কেউ গালাগাল দেয়, কেউ মজা লড়াবার চেষ্টা করে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। পিয়ারীর চেহারা এক বছরে আস্তে আস্তে কেমন ক'রে বদলে গেল পিয়ারী জানল না। দেশী মদে শরীরে একটা ফুলো ফুলো ভাব এসেছে। গাল দুটো টোল হয়ে গেছে। চোখে একটা রক্তাভ রুক্ষতা। ডান হাতের কব্জিতে চামড়ার পট্টি। পরনে নীল প্যাণ্ট। গায়ে রঙীন রেশমী গেঞ্জী। গলায় বাঁধা রুমাল। পায়ে চটি।······একটা বছর অনেক কামিয়েছে পিয়ারী। গাড়ির দেনা প্রায় শোধ হয়ে এল। আর ক' মাস।

রাজারামের বুড়ো শরীর আরও ভেঙে যাচ্ছে। ঘোড়াটার পায়ে ঘা। এক্কার সওয়ারী ভট্‌ভটিয়ার জন্যে কমতে কমতে এখন প্রায় রাতের মাছির অবস্থা। কোলিয়ারীর কুলি, মজুর, কামিন তারা পর্যন্ত এক্কা ছেড়ে ভট্‌ভটিয়ায় উঠে পড়ে। বলে, জামাডোবা যেতে তোমায় তিন আনা কেন দেব—ভট্‌ভটিয়াকে তিন আনা দেব। তুরন্ত চলে যাব—আরামে বসে।

রাজারামরা বোঝায়, আরে ইয়ে জানোয়ারকা জান্ হ্যায়, মেশিন না হ্যায়।

না তো না, তাতে কি ? আমার জানোয়ার কি মেশিন দেখার কথা নয়, পয়সা ফেলব—আরামে যাব।

তা ঠিক। জানোয়ার জানের দাম তুমি দেবে কেন ? আড়াই টাকায় আশী মাইল চলে যে গাড়ি—তাকে তুমি দাম দেবে। তুমি মানুষ, আরাম বোঝ—আয়াস বোঝ জান-প্রাণ বোঝ না।

একাআলা আর ভট্‌ভটিয়াঅলাদের মধ্যে ভেতরের গণ্ডগোল, রেষারেষি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে ছোটখাট ঝগড়া মারপিটে আর থেমে না থেকে বড় রকম কিছু একটা হব হব করছিল।

ভট্‌ভটিয়াঅলারা বেশির ভাগই ছোকরা। এক্কাঅলারা বেশির ভাগই বয়স্ক।

পিয়ারীকে কানাইলাল একদিন বললে, 'এই পিয়ারী তোর বাবা রাজা ভাগার রাস্তায় বিশুয়ার গাড়িকে বেকাদায় চাপতে গিয়ে গাড্ডার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বহুত খারাপ হাত। বেচারী বিশুয়ার লোকসান কোন্ দেবে ?'

পিয়ারী কোন জবাব দেয় না অনেকক্ষণ। পরে বলে, বিশুয়ার কি আঁখ ছিল না ? ও কি জানানা ? ঘোড়াটার পেটে গাড়ি ঘুসিয়ে দিতে পারল না ?

কানাইলাল বললে, এক্কাঅলাদের একদিন ঠাণ্ডা ক'রে দিতে হবে। শালারা হরবখত শয়তানী করছে।

পিয়ারীও মনে মনে তাই চায়। এক্কা ষ্ট্যাণ্ডের তলাটা সে ফাঁকাই দেখতে চায়। বুড়ো মানুষ, বুড়ো ঘোড়া আর ঘাসের বস্তা পরিষ্কার হয়ে যাক। ঝরিয়া বাজারে ওদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

ক' দিন পরের কথা।

রাত ন'টারও অনেক পরে পিয়ারী গাড়ি রেখে তার ঘরে এল।

রোজকার মতন নেশায় চোখ জড়ানো। সারা দিনের ক্লান্তি যেন শরীরের মধ্যে ফুটে ফুটে এবার মিশিয়ে—ঘুম আসছে। হাতে একটা বেলফুলের মালা। মুখে স্ফূর্তি দেওয়া পান।

ঘরে আসতেই গোবিন্দ—ফলওয়ালা, গোবিন্দর বোন চম্পা অন্ধকার থেকে কখন ঝপ করে সামনে এসে দাঁড়াল। পিয়ারীর নেশা আজ খুব বেশি নয়, তবু চম্পাকে ঠিক চিনতে পারল না।

কে ?

আমি, চম্পা।

চম্পা ? কিয়া বাত—

চম্পা কোনো কথা বলল না। ঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। লণ্ঠনের একটু আলো দেওয়াল আর মাটিতে।

পিয়ারী দু' পা সরে এল চম্পার কাছে। নেশার চোখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে চম্পার শরীরে আজ কেমন এক অবসাদ।' পিয়ারীর ভাল লাগছিল না। চম্পাকে হাসি খুশিতে ভাল লাগে। ভাল লাগে কাঁচের চুড়িতে, ছাপা শাড়িতে, পিঠের ওপর লম্বা বেণীতে।

চম্পার হাত ধরলে পিয়ারী।

পিয়ারীর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন মুখ আর একরাশ কান্না নিয়ে ভেঙে পড়ল চম্পা, হাতের বেল ফুলের মালাটা চম্পার চুলে গালে ঘসে ছিঁড়ে গেল।

আমাকে নিয়ে তুমি ভেগে চল পিয়ারী। আমার বাচ্চা হবে। আমার বাচ্চা তোমার কি কেউ নয় ?

মদের চোখে পিয়ারী চম্পাকেই দেখছিল—তার বেশি কিছু নয়। চম্পার স্বামী যে তিন বছরেরও বেশি কোথায় পালিয়ে গেছে আর আসে নি, হয়তো আর আসবে না—পিয়ারীর এখন তা মনে পড়ল না। মনে পড়ল না, রোগা অথচ ফরসা সুন্দর গড়ন এই মেয়েটার কান্নায় এত ব্যাকুলতা কিসের।

চম্পাকে আরও ঘন ক'রে কাছে টেনে নিল পিয়ারী।

একা ষ্ট্যাণ্ডে হরতাল লেগেছে। ত্রিশ চল্লিশটা টাঙ্গা মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। ঘোড়াগুলো মাঠে চরছে বোধ হয়—কিংবা ঘরে বাঁধা আছে। আর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন এক্কাঅলা গোল হয়ে বসে আছে ষ্ট্যাণ্ডের পিছনে ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

সকালে দারোগা সাহেব এসেছিল। এক্কাঅলারা এক্কা চালাবে না। ছোট দারোগা ভট্‌ভটিয়াঅলাদের কাছে ঘুষ খেয়ে কাল রাত দশটার পর বাজারের মধ্যেই রামরিককে মেরেছে। মেরে একেবারে আধমরা করে ফেলেছে। তার দোষ এই, সিনেমার সওয়ারী নিয়ে রামরিক তার এক্কায় তুলেছিল—এমন সময় বিশুয়া তার ভট্‌ভটিয়া রামরিকের পাশে এনে সওয়ারী ভাগিয়ে নেবার জন্য ডাকতে লাগল। রামরিকের সঙ্গে এই নিয়ে বচসা হতে হতে হাতাহাতি শুরু হচ্ছিল এমন সময় ছোট দারোগা এসে রামরিককে মারতে শুরু করল। বাজারে লোকজন তখন নেই বললেই চলে। তবু তারা আর অন্য ক'জন এক্কাঅলা না ছুটে এলে রামরিককে মেরেই ফেলত ছোট দারোগা।

হরতালের ধুয়োটা তুলেছিল রাজারাম। শুনে পর্যন্ত সকাল থেকেই এক্কাঅলারা আজ আর তাই ঘোড়া জোতে নি।

দারোগা বললে তোমরা এক্কা চালাও—আমি দেখছি ছোট দারোগা কেন মেরেছে রামরিককে।

রাজারাম মাথা নাড়ল। এর একটা ফরসালা চাই। ঘোড়ার জান আর মেশিনের জান এক নয়। ভট্‌ভটিয়ারা দু' আনা তিন আনায় চার পাঁচ মাইল রাস্তা যেতে পারবে না। হুজুর, তুমি ওদের ভাড়া বেঁধে দাও। আমাদের পেটের দানা শালারা নিয়ে নিচ্ছে।

হুজুরের ক্ষমতা হয়তো ছিল না। পুলিস মোতায়েন করে দারোগা পালাল।

সারাটা দিন ভট্‌ভটিয়াঅলাদের আজ মহোৎসব। রিকশার গদি থেকে পায়ের তলায় জায়গাটুকুতে পর্যন্ত লোক চাপিয়ে হরদম ট্রিপ মারছে।

বিকেলের দিকে ঝগড়া লাগল। চারটে পুলিসের সাধ্য ছিল না সামলায়। কানাইলালের অটো-রিকশার ওপর তাগ ক'রে কে একজন ইঁট মারল প্রথমে। ওই নিয়ে সুরু। কিন্তু চক্ষের পলকে বুড়ো এক্কাঅলার দল একদিকে—ছোড়া ভট্‌ভটিয়াঅলারা একদিকে? ঘোড়ার বুড়ো জানের সঙ্গে সস্তায় চালু-মেসিনের লড়াই।

বাজার থমথমে হয়ে গেল। সোডার বোতল ফাটল অন্তত দশ ডজন, ইঁট পাটকেল, লাঠি। আগুন জ্বালিয়ে দিল কে পিয়ারীর গাড়িতে। সন্ধ্যার রক্তরঙীন গোধূলিতে 'পবন' দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

পুলিস এসে সারাটা বাজারে ছড়িয়ে গেল—ঘেরাও ক'রে ফেললে এক্কা ষ্ট্যাণ্ড।

রাজারাম কই?

পুলিসে ধরল।

পিয়ারী কই?

থানায় গেছে।

না থানায় যায় নি। সারা সন্ধ্যে পাগলের মতন স্টেশন আর এদিক ওদিক ঘুরেছে পিয়ারী। তারপর গেছে মদের দোকানে। আকণ্ঠ মদ খেয়ে অনেক রাতে থমথমে অন্ধকার বাড়ীতে ফিরে এসেছে।

চম্পা আজও জেগেছিল। দুর্ভাবনায় পাংশু, আকুল। চম্পা সারা সন্ধ্যে আর রাত কেঁদেছে।

তোমার গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে তোমার বাপ, পিয়ারী? তুমি চোট খেয়েছ?

পিয়ারীর মাথায় চোট আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় চোট আজ দিয়ে এসেছে তার বাপকে। বাড়ী গিয়েছিল লুকিয়ে পিয়ারী। বাপের ঘোড়াটাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। থানা থেকে ঘুরে এসে রাজারাম দেখবে, তার ঘোড়াটা মরে গেছে।

পিয়ারী দর দর ক'রে ঘামছিল।

চম্পা ভয়ে কাঠ হয়ে পিয়ারীকে দেখছিল। কিন্তু কই পিয়ারীর চোখ তো শয়তানের মতন জ্বলছে না। বরং মনে হচ্ছিল সব যেন বুজে আসছে। চোখ ভরে ওর ঘুম। আর কান্না।

পেটের ওপর কেমন ক'রে যেন চম্পার হাতটা খানিক শাড়ি খামচে ধরল। পিয়ারীর বাচ্চাও কি এখনি হবে?

চম্পা লণ্ঠনের আলোয় রাজারামের চেহারা কল্পনা ক'রে পিয়ারীকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। আর কল্পনা করার চেষ্টা করছিল নিজের সন্তানকে। বুড়ো বাপে আর জোয়ান বেটার এই লড়াই চলবে? একা আর ভট্‌ভটিয়া। ভট্‌ভটিয়া আর—আর—?

ভীষণ ভয়ে এবং কান্নায় ভাল ক'রে কিছুই ভাবতে পারছিল না চম্পা। পিয়ারী খাটিয়ার ওপর লুটিয়ে শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

নতুন ভাড়াটে

চিলতে চিলতে ছ'খানা ঘর। ওপরে তিন, নীচে তিন। গাঁথনিটা যেন কোনো রকমে খাড়া করা ; তেড়া-বাঁকা। শ্রী-ছাঁদ নেই। টালির ছাদ। ওপরটায় টিনই বেশি, বাইরেটা টিনের—খালি ঘরের পার্টিশানগুলো এক ইটের দেওয়াল দিয়ে গাঁথা। ওপর থেকে নীচে নামতে কাঠের সিঁড়ি। উঠতে নামতে কাঁপে, ধপ-ধপ শব্দ হয়। ঘরের সঙ্গে এক ফালি বারান্দা। নীচে একটু উঠোন। উঠোনের গা লাগিয়ে সারবন্দী তিনটে রান্নাঘর। পূবের দিকটায় কলতলা।

কে যেন ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল 'টিনের কেল্লা'। কেল্লাই বটে। পাড়ায় ঢুকতে এই বিশ্রী বাড়িটাই প্রথমে পড়ে। সবচেয়ে পুরোনোও। নতুন রাস্তা, নতুন পাড়াকে এই বাড়িই এত কাল আগলে ছিল। তখন ভাড়াটে এসে এই টিনের কেল্লায় উঠত প্রথমে, তার পর উঠতি পাড়ায় নতুন বাড়ি পেলেই একে একে ছেড়ে চলে যেত। তা যাক্, তবু তিন চার বছর এ-বাড়ির একটা ঘরও সপ্তাহের বেশি খালি পড়ে থাকেনি।

আজ-কাল থাকছে। একবার ভাড়াটে উঠে গেলে সহজে আর জুটছে না। টিনের বাড়ি, ইলেকট্রিক নেই, কল-পায়খানা বারোয়ারী, তাও আবার ওপর-নীচে ছ'খানা ঘর না নিলে রান্নাঘর পাওয়া যাবে না—এত অসুবিধে সহ্য করবে কে ?

হরিমোহন মল্লিক ভাড়া কমিয়ে কমিয়ে চল্লিশে এসে ঠেকেছিল। তবুও মাঝে মাঝে খালি পড়ে থাকত টিনের কেল্লার খান দুয়েক ঘর।

এখন এ-বাড়ির সবচেয়ে পুরনো ভাড়াটে উমারা। তা প্রায় বছর দেড়েক কাটল তাদের এখানে। উমার ধারণা, তার মামা

বা মামীর কারুরই গা নেই ; চাড় থাকলে এতো দিনে এ-বাড়ি ছেড়ে কবেই তারা এ-পাড়ার অন্য কোনো ভদ্রবাড়িতে চলে যেতে পারত। মামা তার নির্ঝঞ্ঝাটে মানুষ—এবং সাংসারিক ব্যাপারে ভীষণ কুঁড়ে। সকালে বাজারটুকু করে দেয়, তার পর অফিস, অফিস থেকে বেরিয়ে এখান-সেখান—বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা। বাড়ি ফিরে খাওয়া, বই আর ঘুম। মামিও তেমনি। সকালটুকু সংসারের এটা-ওটা নাড়তে নাড়তেই তারও অফিসের বেলা হয়ে যায়। স্নান করে নাকে-মুখে গুঁজে ছেলেটাকে একটু আদর টাদর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে অফিস চলে গেল। ফিরতে সেই ছ'টা। বিশ্রাম নিল কি নিল না। সারাদিন পরে ছেলেটা মাকে পেয়ে আঁচল চেপে থাকল, পায়ে পায়ে জড়িয়ে রইল। শত রকম বায়না। তাকে খাওয়াও, গল্প বলো, ঘুম পাড়াও। মামির নিজেরও ঘুম পেয়ে যায়। এই তো উমার মামা-মামি। কে করছে বাড়ির খোঁজ! তাদের অসুবিধে তার কতটুকু।

অন্য ভাড়াটে আশা বৌদিরা। ওরা অবশ্য বেশি দিন নয়, মাস পাঁচেক। আশা বৌদিরা চার জন। আধপাগলা পঙ্গু শাশুড়ী, ননদ বাসন্তী—উমার চেয়ে সামান্য বড়ই হবে বয়েসে। বড্ড ঝগড়াটে। আর কনকদা'। কনকদা' ট্রাম কম্পানীতে কাজ করে।

হাসিরা উঠে যাবার পর থেকে পশ্চিমের ঘর দু'খানা খালিই ছিল। এ-বাড়ির নিয়ম মতন—ওপরের একখানা আর ঠিক তার নীচের ঘরখানা।

ভাড়াটে পাচ্ছিল না হরিমোহন মল্লিক। প্রায়ই সকালে এসে উমার মামার কাছে কাঁদুনী গাইত। বুঝলেন সন্তোষ বাবু, সব কটা হয়েছে আমার এমনি। শত্রুতা করছে মশাই, হারামজাদারা ঠ্যাং বাড়িয়ে শত্রুতা করছে। যেই শোনে ভাড়াটে, ঘর-বাড়ি খুঁজছে এখানে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কথা কানে ঢুকিয়ে দেয়। তা না হলে

আমার এ-বাড়ি খালি থাকে? এমন পজিসন্। পা বাড়িয়ে বাস, পার্ক, বাজার—ডে অ্যাণ্ড নাইট টালা ট্যাংকের জল, দিব্যি আলো-হাওয়া, আর মশাই, মাত্র চল্লিশ টাকায় ছু'খানা ঘর একটা রান্নাঘর। দিক্ না দেখি, কোন বেটা দিতে পারে?

এতো গুণ ব্যাখ্যান সত্ত্বেও পাক্কা ছু'টি মাস পশ্চিমের ঘর ছুটো খালিই পড়ে ছিল। ভাড়াটে এল মাত্র সে-দিন; দিন সাতেক আগে, কার্তিক মাসের গোড়াতেই।

নতুন যারা এল, সাত দিনেই তারা এ বাড়ির আর ছু'ঘর ভাড়াটেকে অতিষ্ঠ করে দিল। সবচেয়ে বেশি অসহ্য লাগল উমার। অমন যে ঝগড়াটে বাসন্তী, মাথাপাগলা কনকদা'র মা—তারাও উমাকে এতোখানি অসহিষ্ণু করতে পারে নি।

মীরাকে স্পষ্টই বললে উমা, 'এবাড়ি যদি না ছাড় মামী, আমি কানে কালা, পাগলা—আরো কত কি যে হব, কে জানে!'

'তোমার মামাকে বলো না।' মীরাও বিরক্ত।

'আমি কি আর কম বলেছি। তোমাকেও বলছি। যদি একখানা ঘর পাওয়া যায় কোথাও, এক ফালি বারান্দা—তাও বাপু রাজী। তবু এ থিয়েটারের বাড়িতে আর নয়।'

বাসন্তী চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল। চোখ টিপল উমাকে। অর্থাৎ উঠোনে নতুন ভাড়াটেদের কেউ আছে, কিংবা যাচ্ছে-আস্ছে।

গ্রাহ্য করল না উমা। ঠোঁট উল্টে তুচ্ছ করল যে আছে তার অস্তিত্ব। বলল, 'থাকুক গে যাক্। অতো ভয় কিসের!'

বাসন্তী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু লক্ষ্য করল। তারপর ঘরে এসে নিচুগলায় মীরাকে বলল, 'ওরা সত্যি ভদ্রঘরের নয়। জানেন মীরা বৌদি, আজ আমি ওপরের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম ক'মিনিট। দেওয়ালে যা সব ছবি টাঙিয়েছে! ছি ছি—তাকাতে

লজ্জা করে! এলো গা, ঘাঘড়া উড়ছে, বুকের ওড়না লুটোচ্ছে—কত ভঙ্গির সব নাচ!'

মীরা কথাটা শুনল, কোনো জবাব দিল না। 'আমি তো ভেবে পাই না, মেয়ে তিনটের ওই টিঙটিঙে পায়ে এত জোরই বা আসে কোথা থেকে। এক-আধ ঘণ্টা নাচল, বুঝলাম! এ একেবারে সেই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ ঝুনঝুন সুরু হল তো রাত দশটা পর্যন্ত। এ থামছে তো, ও সুরু করছে।' উমা শাড়ি-কুঁচিয়ে আলনায় রাখতে রাখতে বলল, 'ওই তো শোনো না—ওপরে চলছে এখনও।'

ওপর থেকে সত্যিই নূপুরের শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে হারমোনিয়াম।

'ওদের মা-ও কি সব সময় হারমোনিয়াম বাজায়?' মীরা শুধাল।

'না তো কি! একটু করে থামে, মাঝে মাঝে গান ধরে। আর খালি পান খাচ্ছে, পটের বিবিটি হয়ে রয়েছে! রান্নাবান্না, বাসন মাজা—সব ওই মেয়েরাই করছে ভাগাভাগি করে। উমা জবাব দিল মুখ-নাক বেঁকিয়ে, বিরক্ত স্বরে।

নতুন ভাড়াটে যারা এসেছে তাদের পরিচয় বলতে এইটুকু। তিনটে মেয়ে আছে। রোগা রোগা। আধ ফরসা। মোটামুটি দেখতে। হেনা, মীনা আর রাণী। বড়টা বছর পনেরোর, মেজটা তের-চোদ্দ হবে, ছোটটা বছর দশেকের। মেয়েগুলো সারা দিন পায়ে নূপুর বেঁধে নাচে, হুটহাট বাজার-হাটে যায়, রান্নাবান্না মাজা-টাজাও করে। ওরা গলা ছেড়ে চটুল সুরে গান গায়, সিঁড়ি ধরে তরতর করে নামতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে রেলিং ধরে বেঁকে হেলে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় বোন হাসে, বোনে বোনে কলকল করে কথা বলে, ঝগড়া করে, চুলোচুলি বাধায়।

মেয়েদের মা চারুশীলা। চারুশীলা দাসী। নামটা বাসন্তী চিঠির ঠিকানা থেকে জেনেছিল। চারুশীলার রঙ মেয়েদের তুলনায় অনেক

ফরসা। রোগাও নয়, বেশ দোহারা। মুখটা অবশ্য তেমন সুন্দর নয়, অত টানা-টানা যার চোখ তার ওই বসা নাক, ছোট গোল মুখ, মোটা মোটা ঠোঁট মানায় না। পাতা কেটে চুল বাঁধে বলে চারুশীলাকে যেন আরও কেমন দেখায়! চোখে সব সময় ফিনফিনে চশমাটা আছে।

চারুশীলা সব সময় পটের বিবিটি সেজে আছে। মেয়েগুলো ময়লা, ছেঁড়া, ফাঁসখাওয়া শাড়ী-জামা পরলে কি হবে, মেয়েদের মা ফরসা চওড়াপাড় ভাল ভাল শাড়ী পরেই আছে সব সময়। শাড়ীগুলো পুরনো হয়ত, হয়ত সেলাই টেলাই করা, কিন্তু তা চোখে পড়ার উপায় নেই।

সারা দিনে ক'বারই বা নীচে নামে চারুশীলা! স্নান করতে, কলঘরে যেতেই যা; কদাচিৎ অন্য কাজে। নয়ত ডাবর-ভরা পান নিয়ে ফিটফাট হয়ে ওপরের ঘরে বসে আছে। হারমোনিয়ামের রীড টিপছে মেয়েদের নাচের সঙ্গে তালে তালে, না-হয় নিজেই গাইছে। রক্ষে যে চারুশীলা গলা ছেড়ে গান গায় না, বরং চাপা গুন-গুন সুরেই সেটা সেরে নেয়। হয়ত গলার স্বর খুব চিকণ বলেই উঁচু পর্দায় গলা তুলে গাইতে পারে না। হয়ত এটা তার অভ্যাস। গলার রোগ-টোগও কিছু থাকতে পারে; বিচিত্র কি!

এই তো গেল মেয়েদের আর মার কথা। এই পরিবারের যিনি কর্তা তিনি আবার উল্টো। ভদ্রলোকের নামটা পর্যন্ত কি কেউ আজ পর্যন্ত জানতে পারল না? তাঁর নামে কোন দিন একটা চিঠি এল না? কেউ এল না আজ পর্যন্ত বাড়ি বয়ে তাঁকে ডাকতে কি খোঁজ করতে? ভদ্রলোক অদ্ভুত! সকালে যখন এ-বাড়িতে উনুন-টুনুন ধরে সবে চায়ের পাট বসেছে—ভদ্রলোক স্নান-টান সেরে বাইরে বেরুবার জন্যে একেবারে তৈরি। হ্যাঁ, তখনই বেরিয়ে যান—তার পর সারা দিন বাইরে। দুপুরে আসেন না, বিকেলেও নয়—ফেরেন যখন, তখন এ-বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কি করেন ভদ্রলোক, অফিসে চাকরি না ব্যবসা কে জানে! বোঝার উপায় নেই। হয়ত আদপেই কিছু করেন না। কিন্তু না কিছু করলে চলবেই বা কি করে?

ভদ্রলোকের রোগা, হাড়-হাড় চেহারা, ভাঙা চোয়াল, ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দেখে কে জানে কেন উমার ধারণা হয়েছে, মানুষটা বড় নির্জীব, নিরীহ, বোকা আর ভীতু। চারুশীলা ওঁকে দিয়ে বলদের ঘানি টানাচ্ছে। ঘানি ছাড়া কি—রবিবারে পর্যন্ত মানুষটার বিশ্রাম নেই। সেই সকালে বেরিয়ে যায়—আর ফেরে রাত্রে।

ক'দিন দেখে দেখে কথাটা এক দিন বলল উমা মীরাকে। 'বুঝলে মামী, আমার কি মনে হয় জানো? হেনার বাবা লোকটা বোধ হয় মেয়ে বউয়ের নাচগানের ঠেলায় বাড়ি ছাড়া হয়েছে।'

মীরার মনটা কি কারণে খুশীই ছিল সে-দিন। মাথার কাছে লণ্ঠন জ্বেলে শুয়ে শুয়ে গল্পর বই পড়ছিল। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে, বই সরিয়ে মীরা বললে, 'তোমার মামাও তাই বলছিল।' বলে মীরা হাসল। যে-কথাটা ভেবে হাসি এল সে-কথাটা উমাকে বলা যায় না। সন্তোষ বলেছিল, 'সব স্বামীই শেষ পর্যন্ত রাতটুকুর জন্যেই স্বামী থাকে, বাকি সময়টা তারা হয় বাজার সরকার, নয় ভাই, ভাশুর।'

'হেনা-মীনাদের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় না?' মীরা শুধাল।

'না।' উমা মাথা নেড়ে অবহেলার ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টাল, 'ওই বড় জোর বালতিটা সরিয়ে নাও কল থেকে, সদরটা বন্ধ করে দিয়ো। এর বেশি নয়। কে কথা বলবে ওদের সঙ্গে! দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। সারা দিন তিন বোনে নাচছে, রঙ-ঢং করছে আর হোটেলখানার মতন দু'টো গিলছে।'

'বাসন্তী ঝগড়া-ঝাঁটি করে না ওদের সঙ্গে?' মীরার যেন মজা লাগছিল। 'বাসন্তীকে ওরা শিল-নোড়ায় বেটে খেতে পারে। আমার

সঙ্গে কী ঝগড়াটাই করেছে এতো কাল, এখন একটি কথাও বলতে পারে না।' উমা একটু থেমে বলল আবার, 'আজই তো কি যেন বলতে গিয়েছিল—তিন বোনে চিলের মতন তিন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষে আশা বৌদি থামায়। সত্যি মামী, এই আশা বৌদি একটা লোক এ-বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা থেকেও যেন থাকে না। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত নেই। ওই ধিঙ্গী মেয়ে তিনটে পর্যন্ত আশা বৌদিকে একটু সমীহ-টমীহ করে বলে মনে হয়।'

একটু চুপচাপ। উমা যেন কি ভাবছিল। মীরা বইয়ের পাতাটা আবার খুলতে যাচ্ছে, উমা হঠাৎ বলল, 'জানো মামী, সব বাজে কথা! এই মেয়ে তিনটে জন্মে কোনো দিন থিয়েটারে নাচেনি। ওই যে বাসন্তী বলছিল না, এরা দু-বোন থিয়েটারে সখীর দলে নাচে—কথাটা বাজে।'

'কি করে জানলে তুমি?' মীরা প্রশ্ন করল।

'আশা বৌদি বলেছে। আশা বৌদি ওদের জিজ্ঞেস করেছিল।'

'তা হলে তো ভালই।' মীরা আলোচনাটা এখানে শেষ করে গল্পের মধ্যে আবার ডুবে গেল।

উমা তাকিয়ে তাকিয়ে তার মামীর এই আগ্রহ ভাবটা লক্ষ্য করল। মীরা না চাইলেও উমার ইচ্ছে ছিল আরও ক'টা খবর মামীকে দিয়ে দেয়।

এই খবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে, চারুশীলা হেনার বাবাকে বলে দত্ত মশাই। এ আবার কোন ঢঙের ডাক! বাসন্তী নিজের কানে কাল শুনেছে চারুশীলাকে ডাকতে। এই থেকে বাসন্তীর সন্দেহ ওরা স্বামি-স্ত্রী নয়! উমাকে কথাটা বলেছে বাসন্তী। উমার নিজেরও তাই মনে হয়। কিন্তু স্বামি-স্ত্রী না হলে রাত্রে ওরা দু'জন ওপরের ঘরে—আর মেয়ে তিনটে আলাদা নীচের ঘরে থাকবে কেন?

কথাটা মামীকে ঠিক সরাসরি বলার মতন নয় বলে উমা বলতে পারছিল না এতোক্ষণে, নয়ত বলে ফেলত।

মেয়েগুলোও সারা দিনে কখনো ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলে না। ওদের মুখে বাবা শব্দটা কোনো দিন শোনা গেল না।

উমার এই সব খবর দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মীরার নিস্তব্ধতায় সে আর কোনো উৎসাহ পেল না। চুপ করে গেল।

উমার যতই অসহ্য হোক, বাসন্তী যতই আড়ালে আড়ালে নজর রাখুক—নতুন ভাড়াটেদের কিছুতেই কিছু আটকাল না। কার্তিকের গোড়ায় ওরা এসেছিল, দেখতে দেখতে কার্তিক শেষ হল, অগ্রহায়ণও কাটল, পৌষের মাঝামাঝিতেও তিন বোনের নাচ আর হুটোপাটি, চারুশীলার হারমোনিয়াম বাজানো আর গুনগুন গান থামল না। পুরনো ভাড়াটেদের সাধ্য হল না হেনা-মীনাদের খেয়াল খুশি এবং মর্জিতে বাধা দেয়।

ধীরে ধীরে সবাই বিরক্ত, বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল। মীরা, সন্তোষ, কনক, কনকের মা—সকলেই।

সন্তোষ বাড়িওলা হরিমোহন মল্লিককে কথাটা বলেছে। কান পেতে শুধু শুনেই গেছে হরিমোহন। মাথা নেড়ে বলেছে বটে, 'না-না এ সব আমার বাড়িতে চলতে পারে না, আমি বলবো দত্ত মশাইকে।' কিন্তু হরিমোহন বাস্তবিকই কিছু বলেছে বলে মনে হয় না।

সন্তোষ আরও দু'-পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। হরিমোহন ইচ্ছা করেই হোক, কিংবা সত্যিই না-জানার দরুণ হোক—কিছুই বলতে পারে নি। হরিমোহন বলতে পারে নি—দত্ত মশাইয়ের পুরো নাম কি, তিনি কিসের ব্যবসা করেন। চারুশীলা দাসীর নামে বাড়ি ভাড়ার রসিদ কাটা হয়—এইটুকু ছাড়া হরিমোহন কিছুই জানে না।

আড়াই মাস এই নাচিয়ে মেয়েদের আর গাইয়ে মাকে দেখে দেখে এ-বাড়ীর লোকেদের একটা মোটামুটি ধারণা এদের সম্পর্কে হয়ে গেছে। এরা ভদ্র পরিবার নয়। দত্ত মশাই এবং চারুশীলার মধ্যে লোকদেখান সম্পর্কটা যাই হোক্, আসল সম্পর্কটা ভাল নয়। মেয়েগুলো বেহায়া-বদমাস। আর দত্ত মশাইয়ের সারা দিন বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকার মধ্যে কোনো রহস্য আছে। অর্থাৎ বলতে গেলে এদের সমস্ত পরিবারটার মধ্যেই রহস্য রয়েছে। কনকের ইচ্ছে, পুলিসে একটা চিঠি দিয়ে দেয়। সন্তোষ অতটা যেতে রাজী নয়। কোথা থেকে কি দাঁড়াবে, তারপব থানা আর কোর্ট ছুটোছুটি করো।

সমস্ত বাড়িটাই যখন হেনা-মীনাদের ওপর বিরক্ত, বীতস্পৃহ—তখনই এক দিন কাণ্ডটা ঘটল।

এক ছোকরা দিন তিনেক ধরে চারুশীলার কাছে আসা-যাওয়া করছিল। চেহারাটা ভাল কিন্তু সাজ-পোষাক দেখলে হাসি পায়, কথাবার্তা শুনলে ছোকরাকে ফোতো কাপ্তেন গোছের মনে হয়। বাবরি চুল, ঢিলে পায়জামা। সিল্কের রুমাল। ছোকরা আসত আর চারুশীলার ঘরে বসে চা-পান খেত, হেনা-মীনারা নাচলে তাদের নাচের সঙ্গে তবলা বাজাত, মুখে বোল দিত।

যাবার সময় চারুশীলার ঘর থেকে নেমে এসে নীচের ঘরে বসে হেনা-মীনাদের সঙ্গে খানিক ফষ্টিনষ্টি করত। হেনা তাকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। হাসত। গা ঢলাত।

এই ছোকরাকে নিয়ে যে চারশীলাদের সংসারে এতো তাড়াতাড়ি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে কেউ কল্পনা করে নি।

সেদিন দত্ত মশাই একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন। রাত ন'টা বেজে গেছে তখন। শীতের প্রকোপটা সবে পড়তে শুরু করেছে।

উমারা খাওয়া-দাওয়া সারছিল। বাসন্তীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আশা বৌদি কনকদা'র পথ চেয়ে বসেছিল। হঠাৎ চেঁচামেচিটা কানে গেল। উৎকর্ণ হল সবাই।

চারুশীলার ঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু সেই ঘর থেকেই দত্ত মশাইয়ের বিশ্রী রকম চিৎকার আর গালিগালাজ ভেসে আসছিল। যে-লোকটার গলা গত আড়াই মাসে শোনা যায় নি—সেই লোকটা হঠাৎ এই রাত্রে ক্ষেপে গেল না কি?

দত্তমশাই বাস্তবিকই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। চারুশীলার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে এলেন। এসেই নীচের ঘরে ঢুকলেন। হেনা-মীনা-রাণী বোধ হয় শুয়েছিল চুপচাপ। আচমকা কে যেন ককিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে চড়-চাপড়ের শব্দ।

চারুশীলাও তরতর করে নেমে এল। হেনাদের ঘরের লণ্ঠনটা ভেঙে গেছে কারুর পা লেগে। ঘর অন্ধকার। রাণী ভয়ে চিলগলায় চিৎকার করছে আর কাঁদছে। মীনা অন্ধকারেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের শাড়িটা ঘরেই পড়ে রয়েছে। শুধু সায়া আর ব্লাউজ পরনে।

চারুশীলা আলো চাইছিল। ভেতরে হেনা পরিত্রাহি চিৎকার করছে। আর দত্ত মশাই মেয়েটাকে অবিরাম চড়-চাঁটি-লাথি মেরে যাচ্ছেন।

সন্তোষ খাওয়া ফেলে লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল। উমা মীরা চৌকাঠের বাইরে এল না। বাসন্তী ঘুম ভেঙে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা বৌদিও।

সন্তোষের হাত থেকে আলোটা নিয়ে চারুশীলা ঘরের মধ্যে ছুটে গেল। সন্তোষ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হেনা মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে। দত্ত মশাই তার চুলের মুঠি ধরে তখনও মেয়েদেরই কারুর চটি দিয়ে পিটিয়ে যাচ্ছেন।

চারুশীলা দত্ত মশাইয়ের হাত থেকে চটিটা কেড়ে নিতে

গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারুশীলার গালে এক ঘা বসিয়ে দিলেন দত্ত মশাই।

তার পর যা শুরু হল সেটা নরক কাণ্ড। চারুশীলা চিলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঁচড়া-আঁচড়ি, খামচা-খামচি; চারুশীলা কামড়ে দিল, দত্ত মশাই ফরফর করে চারুশীলার শাড়ী ছিঁড়ে দিলেন।

সন্তোষকে এগিয়ে যেতেই হল। আশা বৌদিও গিয়ে চারুশীলাকে ধরলে। হেনাকে ততক্ষণে মীরা আর বাসন্তী বাইরে টেনে এনেছে।

মারামারিটা থামলে গলাটা চড়ল এবার দু-জনেরই। দত্ত মশাই এবং চারুশীলার।

দত্ত মশাই বলছিলেন, 'ছেড়ে দিন, মশাই! ওই বেশ্যা মাগীটাকে আজ আমি মেরেই ফেলব। হারামজাদী কত সুখের-পায়রা ধরে দেখব আমি।'

সন্তোষ দত্ত মশাইকে জাপ্টে ধরেছিল। বললে, 'আ, চুপ করুন। কি যা' তা বলছেন। ভদ্রলোকের বাস এ-বাড়িতে। মুখ খারাপ করবেন না।'

চারুশীলাকে আশা বৌদি তার সামর্থ্যে আগলাতে পারছিল না। চারুশীলা প্রায় হুড়-মুড় করে দত্তমশায়ের ঘাড়ে এসে পড়ল। 'ধরবো আমি—হাজার বার ধরব। মেয়ে তোমার না আমার? আমার মেয়েদের আমি নাচিয়ে করি, বাজারে করি—যা খুশি করি—তোমার বলবার কি আছে?'

'আলবৎ আমার বলার আছে।' দত্ত মশাই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন আর কি। 'তোমার মেয়ে! তাও যদি মাদি-কুকুরের মতন না স্বভাব হত। আমার জানতে কিছু বাকি নেই, ওই তিনটের কোন্‌টা কার আমার তা জানা আছে।'

'চুপ, চুপ, তোমার মুখে আমি লাথি মারব। বদমাস, পাজী মিনসে কোথাকার!' চারুশীলা সত্যিই দত্ত মশাইয়ের গায়ে এসে পড়ল।

'তুমি আমার বড় ভাল রে!' দত্ত মশাই কুৎসিত ভাবে হেসে উঠলেন, 'থিয়েটারের মেয়েমানুষ ছিলে, আজ এর, কাল তার। মেয়ে তিনটে তো একটা উমেশ ম্যানেজারের, একটা অ্যাক্টর কাশীর, আর একটা ফ্লুট বাজিয়ে কেষ্টর!' দত্ত মশাই হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। দম নিচ্ছিলেন তিনি।

চারুশীলার হঠাৎ কি যেন হল। লণ্ঠনের আলোতেও দেখা গেল তার চোখ ভীষণ ভাবে জ্বলছে। থরথর করে কাঁপছিল চারুশীলা। চিকণ-চেরা গলায় চারুশীলা বলল, 'হোক আমার তিন মেয়ে তিন জনের। তবু তারা আমার মেয়ে—বুঝলে তারা দত্ত, চারুশীলার মেয়ে—খোলার বস্তী থেকে যে উঠে উঠে কলকাতার নাটমহলের রাণী হয়েছিল। আমার মেয়েরা থিয়েটারে নামবে, আমি তাদের নামাবোই। তুমি আটকাতে পারবে না।'

তারা দত্ত চুপ। চারুশীলার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে থাকল। তার পর বলল, 'পাঁচ বছর যে আমি তোমাদের চারটে মুখের খোরপোস চালালাম সে কি এই জন্যে?'

চারুশীলা সে-কথার জবাব দিল না। যেন কানেই তুলল না কথাটা। বরং স্পষ্ট করেই বললে, 'অনাদিকে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি। হেনা মনমোহন থিয়েটারেই ঢুকবে।'

তারা দত্ত সন্তোষের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। চারু-শীলার দিকে আর চাইল না। দেওয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'মেয়েগুলকে তুমি নষ্ট করবে না দিব্যি করেছিলে। মা কালীর পট ছুঁয়ে, আমার গা ছুঁয়ে। পাঁচ বচ্ছর আমি তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমাদের জন্যে খেটেছি। থিয়েটারের সিন্ এঁকেছি। নতুন বাজারে গিয়ে সাইন বোর্ড লিখেছি। কেন করলাম এতো সব, তোমরা আমার কে?'

চারুশীলা গায়ের আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে বাইরে এল। হেনাকে

এক হাতে, মীনাকে আর এক হাতে ধরল। সামনে বুকের কাছে রাণী। সিঁড়ির কাছে এসে তিন মেয়েকে নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে চারুশীলা যেন সকলকে শুনিয়ে বলল, 'তোমার বাতিকের জন্যে আমার আখের আমি নষ্ট করেছি। মেয়েদের আমি নষ্ট করতে পারব না। আর মেয়ে যখন তোমার নয়, অন্য তিন পুরুষের, তখন তোমার অত দরদ কিসের? হোক না তারা নষ্ট।' শেষের 'নষ্ট' শব্দটা চারুশীলা তারা দত্তর স্থর নকল করে বললে তার পর তিন মেয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চলে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

তারা দত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে যেন তার কেউ মারা গেছে।

তারা দত্তর চোখে দিয়ে টসটস করে জল পড়ছিল। সন্তোষ সামনে থেকে সরে গেল। ভাবতে ভাবতে গেল, মেয়ে তিনটে সত্যি কার—চারুশীলার না তারা দত্তর, না অন্য তিন জনের?

পরের দিন তারা দত্তকে এ-বাড়িতে আর দেখা গেল না। মানুষটা আর ফিরল না সত্যি।

চারুশীলাও মাঘ মাসে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মেয়েদের নিয়ে।

বরদাকান্ত লণ্ড্রী

ট্রাম থেকে যখন নামলাম বৃষ্টি তখনও থামে নি, সামান্য একটু কমেছে। পথে জল জমে গিয়েছিল। ভালো করে পথ ঠাওর করতে পারছিলাম না। যে-দিকে এগুচ্ছি—সেই দিক থেকে বৃষ্টির ছাট আসছে। চশমার কাঁচ দুটো জলে ঝাপসা। রাস্তার লাইট্ পোস্টের আলোও এখানটায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এক হাঁটু জল ভেঙে গলির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই আবার এমন জোরে জল এল যে সামনে এগুনোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ওদিকে আবার গলির মোড়ে আসতেই বুঝতে পারলাম—এ-রাস্তায় হাঁটুজল প্রায় কোমরে ওঠার অবস্থা।

কি করব না-করব ভাবতে গিয়ে যখন দিশেহারা, চোখে পড়ল ক'পা দূরেই বরদাকান্ত লণ্ড্রীর আধ খোলা দরজা আর আলো।

বরদাকান্ত লণ্ড্রীতে এসেই উঠে পড়লাম। মুখ আর চশমা কোনো রকমে মুছে তাকাতেই চোখে পড়ল কাউন্টারটার ওপাশে ছোকরা মতন সেই ভদ্রলোক একাই বসে রয়েছে। দোকানে আর কেউ নেই। একটা উনুন জ্বলতে দেখি রোজ, আজ দেখলুম উনুনও জ্বলছে না। কাঁচের পাল্লা দেওয়া কাপড় রাখা র‍্যাকে বড় সাইজের এলার্ম ঘড়িটার কাঁটা ন'টার ঘর ধর ধর করছে।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে ছোকরা হঠাৎ বললে 'ইস্, খুব ভিজেছেন দেখছি। মাথা ভর্তি জল। দাঁড়ান মোছার একটা কিছু দি।' কথা শেষ করেই ছোকরা উঠে দাঁড়াল। কাপড় রাখা র‍্যাকের পাল্লা সরালে। কাচা শাড়ি ধুতি শার্ট পাঞ্জাবীর থাক্ সরিয়ে একটা সদ্য কাচা ধবধবে পাট করা টার্কিশ টাওয়েল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

কার না কার টাওয়েল, মাথা মুখ মুছে রাখব, তারপর সেই অবস্থায় আবার পরিপাটি ভাঁজ করে যথাস্থানে ডেলিভারি দিয়ে দেবে—এ-সব ভেবে আমার অস্বস্তি এবং সংকোচ হচ্ছিল। বললাম,

'না—না—, মাথা মোছার দরকার হবে না। বেশ আছি। কতক্ষণই বা আর বৃষ্টি, একটু ধরলেই ছুট দেব। কাছেই আমার বাড়ি।'

'জানি। আপনি তো এগারো নম্বরে থাকেন—পি, কে, সেন!' ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ করে বললে, 'বৃষ্টি এখন থামছে না; থামলেও চক্রবর্তীদের বাড়ির ও-দিকে আর এগুতে পারবেন না, সাঁতার কাটতে হবে মশাই। নিন্—গা মাথা মুছে ফেলুন।'

আমি তবুও সাহস পেলুম না, হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিতে পারলুম না।

অল্পক্ষণ আমার দিকে চেয়ে যেন আমার দ্বিধার কারণটা বুঝে নিলে। হাসি মুখেই বললে ও, 'আমার দোকানের জিনিস আপনি নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারেন। আমরা সব কাপড়েই ব্লীচিং পাউডার দি। না, না, একটা পরিমাণ আছে। কাপড়ের তাতে ক্ষতি হয় না অথচ ময়লা কাটে খুব ভাল। দেখুন না, কী রকম ফরসা হয় আমার লণ্ড্রীর ধোওয়া কাপড় জামা—একেবারে মিল্ক্ হোয়াইট্।'

অগত্যা তোয়ালেটা নিতে হল। এবং মাথা মুখ ভাল করে মুছতে হল। তোয়ালেটা ফেরৎ দিতে দিতে বললাম, 'এটা আপনি আব একবার কাচিয়ে ডেলিভারী দেবেন। অবশ্য পয়সাটা আমিই—'

ভদ্রলোক মাথা হেলালে, বললে, 'বিলক্ষণ! ও-সব আমায় বলতে হবে না। মশাই এ-পাড়ায় পনেরো বচ্ছর দোকান আমাদের। পাড়াব সবাই আমার খদ্দের। আলতু-ফালতু দায়-সারা কাজ করলে কি রক্ষে ছিল।' আমার হাত থেকে তোয়ালেটা নিয়ে কোণের গাদা করা ময়লা কাপড়ের ডাঁইয়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিলে ভদ্রলোক।

কাউন্টারের এ-পাশেও একটা টুল ছিল। বসলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ খুব মনোযোগে একটা বিল বই ওল্টাতে সুরু করল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হল, ওর বয়স বেশি

নয়। বড় জোর বছর বত্রিশ যদি হয়। আমার চেয়ে সামান্য ছোটই হবে।

হঠাৎ বিল বই মুড়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন হতাশ গলায় বললে ছোকরা, 'আর একটা দিন আগে হলেই দিব্যি সব হয়ে যেত। ওই ভিজে কাপড় জামা এখানেই ছেড়ে রেখে কাচা শুক্‌নো কাপড় জামা চড়িয়ে চলে যেতে পারতেন। আপনার তো কাপড় রয়েছে এখানে কিন্তু ডেলিভারী ডেট্ আগামী কাল।'

চমৎকৃত না হয়ে পারছিলাম না। ভদ্রলোকের দেখি কিছু আর জানতে বাকি নেই। আমার নাম, ধাম—কাপড় ডেলিভারী দেওয়ার দিন! সবই।

হেসে বললুম, 'আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক। এক মাসও হয় নি এ-পাড়ায় এসেছি। আপনি দেখি তার মধ্যে সবই জেনে ফেলেছেন।'

'জানবো না—' ভদ্রলোক যেন আমার কথায় অবাক হয়ে বললেন, 'আমার দোকানের ওপর দিয়ে আপনাদের দুবেলা যাওয়া আসা, এ-বেলা ও-বেলা রসিদ কাটছি—আমি আবার না জানবো কি? সব জানি মশাই, সব্বাইকে। এ-পাড়ার কোন বাড়িতে ক'টা পুরুষ, ক'টি মেয়েছেলে, বাচ্চা কাচ্চা—কিচ্ছু আমার অজানা নেই।'

মজা লাগছিল ভদ্রলোকের কথায়। বাইরে বৃষ্টির দাপট সমানে চলেছে। উপস্থিত পথে নামার কোনো আশাই নেই। একটা সিগারেট ধরালাম, ভদ্রলোককে দিলাম একটা। তারপর আলাপ শুরু করলাম, 'আপনার নামই বরদাকান্ত?'

'না, বাবার নাম। আমার নাম সুধাকান্ত।' ভদ্রলোক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দোকান বাবাই খুলেছিলেন, তাঁর নামেই। বছর ছয়েক হল মারা গেছেন।' বলে সুধাকান্ত দেওয়ালের দিকে তাকালে। দেখলাম সেখানে একটা কাঁচে বাঁধানো ফটো। বরদাকান্তর নিশ্চয়।

বললাম, 'তবে তো এ-দোকানে আপনারও কম দিন হলো না!'

'কম আর কই—!' সুধাকান্ত বললে, 'আমি মশাই যখন মেট্রোপলিটান ব্রাঞ্চ স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে গোঁত্তা খাচ্ছি, বাবা চায়ের কারবারে ফেল মেরে এখানে লণ্ড্রী খুলে বসলেন। আমার তখন এ-সব ভাল লাগে নি—এই লণ্ড্রী বিজনেস্। যাক্ সে-সব পুরনো কথা। ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলাম তিনবারে। ভাগ্যিস এই দোকানটা ততদিনে বেশ চালু হয়ে গেছে—নয়তো যা দিনকাল, ম্যাট্রিক পাশের আর দাম কি, বেকার থেকে উপোস করে মরতে হত।' সুধাকান্ত একটু থেমে বাইরে তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'দেখুন, এখানে এই কাপড়ের গাদায়—লণ্ড্রীর ছোট ঘরে বসে বসে কম তো দেখলুম না। তা বলতে কি এই পাড়ার একটা ছোট খাটো ইতিহাস আমার গত পনেরো বচ্ছর দোকানের ক্যাশ মেমোর পাতায় লেখা হয়ে গেছে।'

সুধাকান্ত থামল। কিন্তু সুধাকান্তর কথা বলার ধরন আমার ভাল লাগছিল, আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। বললাম, 'এই দোকানে বসে বসে এতো দেখলেন!'

'দেখলাম না—, ক-তো দেখলাম—!' সুধাকান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, 'এই পাড়ায় কতো কাণ্ড ঘটে গেল, কতো অদল বদল। দশ বছর আগে যার বাড়ি থেকে কঁাচি পাড় দিশী ধুতি, ঢাকাই আর ধনেখালি ছাড়া কিছু ধুতে আসত না—আজ সেই বাড়ি থেকেই মিলের মোটা মোটা শাড়ি ধুতি ধুতে আসে। এক সময় যাদের চটের মতন খদ্দর ধুয়েছি আজ তাদের ফিন্ ফিনে বস্ত্র ধুয়ে দিতে হয়। তখনকার দিনে এক রকম ছিল, এখন কতো কি বদলেছে। নতুন ফ্যাশানের ছড়াছড়ি! শাড়ি ধুতে দেয় না চালচিত্তির ধুতে দেয় বুঝতে পারি না, ছেলেদের আবার হাওয়াই সার্ট!' সুধাকান্ত থামল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, দিনকাল বদলাচ্ছে, আগের সঙ্গে এখন অনেক তফাৎ।'

'তফাৎ বলে মশাই! কী যে হচ্ছে দিন দিন! জানেন—' একটা টান দিয়ে আচমকা একটু থামল সুধাকান্ত। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'জানেন এ-পাড়ায় এমন লোকও আছে বিয়ে থায়ে কোথাও যেতে হলে আমার কাছে চুপি চুপি আসে ভালো কাপড় জামা ধার নিতে। আমার বিজনেস এ-সবের নয়। তবু পারি না। দি। কি করবো—একদিন যাদের বুটনি দেওয়া বেনারসী ধুয়েছি আজ তাদের পড়া অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি না।—কি করবো। কতো জিনিসই যে পারি না! এই তো—ওই আঠারো নম্বরের—' আবেগের মাথায় কথা বলতে গিয়ে সুধাকান্ত হঠাৎ কি যেন বেফাঁস বলে ফেলে চমকে থেমে গেল।

আমি কৌতূহল বোধ করলাম। তাকিয়ে থাকলাম। জিজ্ঞাসু চোখে।

সুধাকান্ত একটু বোধ হয় বিব্রত বোধ করছিল। সামলে নিল নিজেকে। বললে, 'মুখ ফসকে যখন বেরিয়ে গেল তখন বলেই ফেলি। আপনি কিন্তু মশাই কাউকে এ-কথা বলবেন না। কেউ জানে না।'

একটু থেমে সুধাকান্ত বললে, 'বেশ কিছুকাল আগের কথা, আমি ম্যাট্রিকটা পাশ করেছি সে-বছর। তখন থেকেই সকাল সন্ধ্যেয় একবার করে আমি এই দোকানে এসে বসতে সুরু করেছি। একদিন সন্ধ্যের দিকে এক ভদ্রলোক চাকরের মাথায় পাহাড় প্রমাণ কাপড়ের এক স্তূপ চাপিয়ে আমাদের দোকানে এসে হাজির। খাশা চেহারা ভদ্রলোকের। কথাবার্তায় বনেদী মেজাজ। তাঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল নেহাত যেন দায়ে পড়ে আমাদের দোকানে এসেছেন, নয়ত এতোকাল সাহেবী পাড়ায় কাপড় কাচিয়েছেন।

বড়লোক মানুষ, মানী খদ্দের—। আমরা তো বাপে বেটায় মিলে হাত কচলে খুব খাতির টাতির করলাম। বাবা সেই বিরাট কাপড়ের পুঁটলি খুলে ফেললেন। আর মশাই বলবো কি—সেই পুঁটলির মধ্যে যেন আবুহোসেনের হারেম লুকিয়ে ছিল। কী রঙ, কী রঙ—সবুজ, নীল, লাল, হলদে, বাসন্তী, আসমানী—আর কত নক্শা, কত ফুল; জরির সোনালি ঝিকিমিকিও। হ্যাঁ, বড়লোক বটে। বাবা আপ্যায়িত হয়ে বললেন, সব আমরা ভাল করে কেচে দেব। বেশম পশম সব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। ভদ্রলোক যেন দয়া করে একটা ট্রায়ল দিতে দিচ্ছেন এমন ভঙ্গি করে বিদায় নিলেন। তা খান দশেক শাড়ি, গোটা আস্টেক সেমিজ সায়া; সেই পরিমাণ ব্লাউজ, এক ডজন ধুতি গেঞ্জি কামিজ, আর—আর গোটা পাঁচেক ফ্রক। সবই এক সাইজের। কী সুন্দর, বাহারী, রেশম আর ফুলের নক্শা করা সব ফ্রক। যেমন তার কাটছাট তেমনি দামী ভালো কাপড়। দেখে দেখে চোখের আশা আর আমার মেটে না। আমাদের দোকানে এতো সুন্দর, এতো বড় সাইজের ফ্রক আর কখনো ধুতে আসে নি। সেই প্রথম।

'হ্যাঁ, তারপর জানলাম ওই ভদ্রলোকই আঠারো নম্বর বাড়িটা কিনে নিয়ে এ-পাড়ায় সবে এসে উঠেছেন। নাম মণিলাল গাঙ্গুলী।

'দিন দুয়েক পরেই হবে দোকানে বসে আছি—বেলা দশটা প্রায় হবে—দেখি একটা মেয়ে স্কুলের গাড়ি গলির মধ্যে ঢুকতে না পেরে ওই খানটায়, ঠিক এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। তার একটু পরে মণিবাবুর পাশে পাশে একটি বছর তেরোর মেয়ে এসে স্কুলের গাড়িতে উঠল। দেখেই বুঝলাম—সব ফ্রকই ওই মেয়েটার। ওর না হয়ে যায় না। অমন সুন্দর মেয়ের। আর ওই বয়সের মেয়েরই। হ্যাঁ, চেহারা বটে। কী সুন্দর, কতো সুন্দর—কি করে বোঝাই আপনাকে। ছিপছিপে গড়ন, লালচে রঙ, যেন ননীর সঙ্গে

একটু সিঁদুর মিশিয়ে ওই রঙ কেউ গুলেছে, একটু লম্বা ছাঁচের মুখ, সুন্দর চোখ, পাতা, ভুরু। টুক্ টুক্ করে গিয়ে স্কুলের গাড়িতে উঠল ছবি।

'ওর নাম ছিল ছবি। পরে জানতে পারলাম। যাক্, সেই থেকে আঠারো নম্বর বাড়ির সব কাপড়ই আমরা ধুতাম। মণিবাবুকে প্রথমটায় দাম্ভিক বড়লোকী মেজাজের মানুষ মনে হয়েছিল কিন্তু মানুষটি ভালই ছিলেন। অন্তত আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভাল ছাড়া মন্দ হয় নি।

'তারপর চোখের ওপর দিয়ে ক'টা বছর কেমন করেই না কেটে গেল। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুলে রিবনের ফুল গুঁজে তেরো বছরের যে ছবি স্কুলের গাড়িতে উঠত—তার রাশ রাশ রঙীন ফ্রক কাচার দিন কবে যেন ফুরিয়ে গেল। আসতে লাগল শাড়ি। কতো রঙের কতো নক্শার। আর আশ্চর্য, ছবির শাড়ি দেখেই আমি চিনতে পারতাম। শাড়িতে একটু বেশি মাড় আর কড়া ইস্তিরি পছন্দ করত ছবি। হ্যাঁ, ওই গাদা কাপড়ের মধ্যে তার পছন্দ-অপছন্দ আমি ভুলি নি। কদাচিৎ তার পছন্দ মতন শাড়ি কাচা হয় নি। এই লণ্ড্রীতে বসে ছবির শাড়ি টাড়ি দেখেই আমি সব বুঝতে পারতাম। কোন্‌টা নতুন এলো। কোনটাই বা বেনারস কী লক্ষ্ণৌ বা বোম্বাই থেকে তার দাদা কী মামা নিয়ে এসেছে। কোন্‌টা তার নতুন পাওয়া—জন্মদিনে অথবা পুজোয় কি ভাই-ফোঁটায়। ছবির টেস্ট্‌টা ছিল বরাবরই ভাল। রঙই পরুক আর নকশা কি ছাপাই পরুক—যা পরত সবই ছিল সুন্দর।

'যাক্—আমার বাবা মারা গেলেন—কিছুদিন পরে ছবির বিয়ে হয়ে গেল। বলবো কি মশাই, বিয়ের ক'দিন আগে পর্যন্ত ছবির কাপড় কেচে ডেলিভারী দিয়েছি। তারপর কিছুদিন বন্ধ হলো। ও তখন শ্বশুরবাড়ি। খুব দূরে নয়, কাছেই। ছবি বাপের বাড়িতে ফিরল

অষ্টমংলায়—আমি এই লণ্ডীতে বসে বুঝতে পারলাম। তার কাপড় জামা এল একরাশ ধুতে বিয়ের সব নতুন জিনিস। ছবি ফিরে গেল কবে—তাও বুঝতে পারলাম। ওর কাপড় ধুতে আসা বন্ধ হলো। কিন্তু সে অল্প ক'দিনের জন্যে। তারপর শ্বশুর বাড়ি থেকেই চাকর দিয়ে ভাল শাড়ি টাড়ি সে আমার দোকানে পাঠিয়ে দিত। এত পছন্দ করত আমাদের কাচা!

'বছর খানেক কী বছর দেড়েক পরের কথা। সেবার আমার শরীরটা খুব খারাপ হল। ভুগলাম কিছুদিন। ডাক্তারে বললে কিছুদিন পুরী টুরী গিয়ে থাকতে। কর্মচারীর হাতে দোকানের ভার দিয়ে গেলাম পুরী। মাস দেড়েক পরে ফিরলাম। পুজোর খানিক আগে আগে—বর্ষা তখনও চলছে।

'যে-দিন ফিরলাম তার পরের দিনই সন্ধ্যে বেলায় দোকানে বসে আছি। এই রকমই আটটা টাটটা হবে। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। আঠারো নম্বর বাড়ি থেকে চাকর এল কাপড় ডেলিভারী নিয়ে যেতে। তার হাতের বিল্‌টা নিয়ে কাপড় খুঁজে খুঁজে মেলাচ্ছি—হঠাৎ দেখি লেখা এক জোড়া থান। থান! চমকে উঠলাম। আঠারো নম্বর বাড়ি? কাপড় কাচার ইতিহাসে থান এই প্রথম। কার থান! কে বিধবা মানুষ এল ও-বাড়িতে!

'চাকরটাকে সুধোতেই সে যা বললে শুনে আমি পাথর হয়ে গেলুম। ছবি বিধবা হয়েছে। এখন বাপের বাড়িতে এসে রয়েছে। থান-জোড়া তার। ছবির।

'আপনি হয়ত অবাক হবেন কিন্তু এ-কথা কাউকে বোঝান মুশকিল যে কেন—হ্যাঁ, কেন ছবির সেই থান জোড়া ডেলিভারী দিতে আমার হাত উঠল না। কিছুতেই মন সায় দিল না। আমি পারলাম না। চাকরটাকে বলে দিলাম—পরে আসতে—থান জোড়া পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

'সে-থান আর পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় দফায় আবার থান হারালাম। বললাম টাকা নিয়ে যাও—ওটা ধোপায় হারিয়েছে। আঠারো নম্বর বাড়ির কাপড়-চোপড় আর আমি কাচতে চাই না—চাই না। তবু তারা কাপড় পাঠাবে। তাদের কাপড় অ্যাসিড ঢেলে ঢেলে ছিঁড়লাম, রঙ জ্বালিয়ে দিলাম, পোড়ালাম। শেষ পর্যন্ত আমার দোকানে কাপড় দেওয়া তারা বন্ধ করল। হ্যাঁ, তাঁরা বাঁচল, বাঁচলাম আমি। কিন্তু—ছবির একটা থানও ধুতে দিয়ে ওরা ফেরৎ পায় নি আমার কাছ থেকে। আমি দিতে পারি নি মশাই; এতে যার যা খুশি মনে করুক। একদিন যার সুন্দর সুন্দর রঙীন ফ্রক ধুয়ে দিয়েছি, তারপর কতো না বাহারী শাড়ি—বউ হবার পরও যার সুখের বস্ত্র কেচে দিলাম—সেই মেয়ের থান আমি কাচতে পারব না, না, কখনোই নয়। এই তো দেখছি—, এ-সবই তো ইতিহাস—হ্যাঁ—একটা মানুষের জীবনের ইতিহাসই বলতে পারেন—।' সুধাকান্ত খানিক চুপ করে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে ধরা ধরা গলায় বললে, 'সেই প্রথম ধুতে দেওয়া থান জোড়া আমি এখনো রেখে দিয়েছি। ওই যে—ওই—'

সুধাকান্তর নির্দেশ মত তাকালাম। কাপড় রাখা কাঁচের আলমারির মধ্যে গণেশের ছোট্ট মূর্তির ডান পাশে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট্। অতি সযত্নে রাখা—বুঝতেই পারলাম।

ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার বলি—ওই প্যাকেট্টা একবার দেখাবেন? কিন্তু সুধাকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সে-কথা বলতে পারলাম না। মনে হল—সেটা ভীষণ নিষ্ঠুরতা হবে। ভীষণ—। মনে হলো সুধাকান্ত ভুল করেছে, তিন বছর নয় আরও বেশি আরও অনেক বছর ধরে। খুব সম্ভব সেই প্রথম দিন থেকেই ছবির রঙ আর সুষমায় মন ভিজিয়ে লোকটা এই লণ্ড্রীর ছোট ঘরে বসে আছে।

ভেণ্ডার

কলোনীটা নতুন। এখনও চুন আলকাতরা সিমেণ্ট সুরকীর গন্ধ পাওয়া যায়। চলতি নাম, নিউ কোয়ার্টারস। আসল নামটা অবশ্য বেশ গালভরা, ক্রিসেণ্ট্ কলোনী।

আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী অঢেল পয়সা খরচা করেছে এই ক্রিসেণ্ট্ কলোনীর মাটিতে। না করে উপায় ছিল না। কোম্পানীর কেনা পুরনো জমিতে আর জায়গা ছিল না। অফিসার্সরা বাংলো পাচ্ছিল না, হাউস আর কার অ্যালাউন্সের নামে মাসে মাসে প্রচুর টাকা নষ্ট হচ্ছিল।

সস্তা দরে জমিটা হঠাৎ পাওয়া গেল। জি, টি, রোডের ওপরেই। পশ্চিম দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে টানা। ঝোপঝাড় খানাখন্দে ভর্তি। তা হোক্, তবু তো জমি পাওয়া গেল এবং সস্তায়। জমিটা কিনে ফেলল কোম্পানী। তারপর একটানা বছর দুই কাজ চলেছে। এখন আর চেনবার উপায় নেই। চারফুট উঁচু বাউণ্ডারী ওয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে একটা ঝকঝকে কলোনী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

তা একটু দূরই হল। ফ্যাক্টরী থেকে প্রায় মাইল দুয়েক, শহর থেকে মাইল পাঁচেক। কোম্পানীর অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। সকাল সাড়ে ছটা থেকে গোটা চারেক স্টেশন ওয়াগন ক্রিসেণ্ট্ কলোনীর পিচঢালা রাস্তা আর নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক, ওয়েষ্ট রোডের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে। এক একটা দল তুলে নিয়ে, এক ছুটে ফ্যাক্টরীর মধ্যে নামিয়ে রেখে আবার পলকে ফিরে আসে ক্রিসেণ্ট কলোনীতে।

সাহেবদের অসুবিধের কিছু নেই। অফিসের গাড়ি এসে নিয়ে যাচ্ছে, পৌছে দিচ্ছে। যখন অফিস নেই—তখন ক্রিসেণ্ট্ কলোনীর

ফিটফাট কোয়ার্টারে নতুন সিলিং ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বিশ্রাম নাও, বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে বসে থাকো, না হয় ক্রসওয়ার্ড করো। মন না বসলে বেড়াও—ক্রিসেণ্ট্ রোডের গাছগাছালি ঢাকা পথে পথে, নয়ত পার্কে।

অসুবিধে যত মেম সাহেবদের। মিসেস্ ভট্টাচার্য, মিসেস্ দত্ত থেকে ললিতা, সুনীতি, মায়া এদের সকলেরই এবং দু চারজন অ-বাঙ্গালী গৃহিনীদেরও। এ যে ছাই কোন্ স্বর্গে বাস হল, না আছে বাজার হাট, না মুদিমদ্দর দোকান টোকান! শহর সেই পাঁচ মাইল পথ। বাসের পয়সা দিলে চাকর বাজার করতে যায়—নয়ত সাইকেল ঠেঙিয়ে দশ মাইল রাস্তা ছুটোছুটি করতে চায় না। আর একবার যদি গেল তা ফিরল দুপুর করে। সাত আনার জিনিসে সতেরো আনা দর তুলল।

তাও না হয় আলুটা বেগুনটা রাখা গেল, কিন্তু তরিতরকারী, শাকসব্জি, মাছ মাংস—এ তো আর তুলে তুলে রাখা যায় না। ফ্রিজেডিয়ারে একটা দিন বড় জোর রেখে খাওয়া যায়—নয়ত যে যতই বল বাপু ও পোষায় না, ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যায়, স্বাদ চলে যায়।

কারখানা অফিসে তোমরা কেউ মুখুজ্যে সাহেব, কেউ দত্ত সাহেব বলে আমরাও কি মেম সাহেব নাকি! চাকর-বাকর আয়া জমাদার বলুক যা খুশি, আসলে অফিসারের বউ হলেও আমরা বাঙালী মেয়ে। খেতে বসলে শাক চচ্চড়ি ঘণ্ট চাই, উচ্ছে মূলো পলতা-পাতা। গেরস্থ ঘরে দু-বেলা মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত উঠোনো যায় না। তাতে আর যাই হোক বাঙালী ঘরের সংসার চলে না। তোমাদের ক্রিসেণ্ট্ কলোনী যতই ডিসেণ্ট হোক্, শোভায় একেবারে স্বর্গ হোক—তবু এ-ছাই জায়গায় আমাদের আর ঘর সংসার করতে হবে না। চাকর বাকরেই লুটেপুটে খাবে।

তা ঠিক, চাকর বাকরই লুটেপুটে এতোদিন খাচ্ছিল। হঠাৎ

সে-দিন ক্রিসেণ্ট্ কলোনীতে বেলা নটা নাগাদ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। নর্থ ব্লকের মেয়েরা বাগান পর্যন্ত ছুটে এল। গেট খুলে দিল সাউথ ব্লকের হাসি, যুথি, বেলারা। বাসি চুলের বিনুনী থেকে রিবন খুলতে খুলতে রবারের চটি পায়ে কিশোরী মেয়েরা ছায়া ধরে ধরে এ-ব্লকে এসে দাঁড়াল।

এতোদিনে একটা হিল্লে হয়েছে। শাকসব্জি আর মাছ নিয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ি এসে ঢুকেছে ক্রিসেণ্ট্ কলোনীতে।

লিলি তো হেসেই বাঁচে না। ওমা, এ আবার কি ধরনের ফেরিওয়ালা! বড় বড় স্টেশনে কাঁচের ঢাকনা দেওয়া চাকা লাগান ঠেলা গাড়ি দেখেছে লিলিরা, মিষ্টি বিক্রী করে—চাই লজেন্স বিস্কুটও। সেই রকমই গাড়ি প্রায়—তবে আরও লম্বা। আর হাতে করে ঠেলে নিয়ে যেতে হয় না, মটর-বাইকের মত কলকব্জা যন্ত্রপাতি লাগানো। তেমনি গরু মোষের সিংয়ের মত হ্যাণ্ডেল।

গাড়িটা অদ্ভুত রকম দেখতে হলেও সুন্দর। যে-মানুষটা এই গাড়ি চালিয়ে শাকসব্জি মাছ বিক্রী করতে এসেছে—সেই মানুষটাও অদ্ভুত এবং সুন্দর। মাথায় সোলার হ্যাট্, পরনে পায়জামা, গায়ে মোটা খদ্দরের চেক্কাটা সার্ট, বোতাম দেওয়া বুকপকেট, পায়ে স্লিপার। ছোকরা একেবারে। বছর পঁচিশ যদি হয় বয়েস। টকটকে রঙ গায়ের, গোলগাল মুখ, হাসিহাসি সবসময়। হ্যাটের ষ্ট্র্যাপটা গলার কাছে এনে ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে, ফলে চুলগুলো দেখা যাচ্ছে মাথার। রুক্ষ লালচে চুল একরাশ।

কথায়-বার্তায় পরিপাটি ছেলে। যত হাসি-হাসি মুখ তত বিনয়। ঝাঁক বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সব—তর সইছিল না এক কোয়ার্টার থেকে আর এক কোয়ার্টারে আসতে। এবং সবাই কী উৎফুল্ল। আহা, কী সুন্দর পালংশাক গো—এখনও তো শীত পড়ল না, এরই মধ্যে! বাঃ! কোথাকার বেগুন? গয়ার? ঝিঙেও এনেছ,

বরবটি পর্যন্ত! চমৎকার! তা মাছ তো বাপু সব একেবারে কাটা আঁশটি পর্যন্ত ছাড়ানো ভাগ ভাগ করা! কি মাছ? রুই—পাকা রুই মাছের স্বাদ ভুলে গেছি এখানে এসে। তা কতো করে? চার? চার টাকা বড্ড বেশী! সাড়ে তিন করো। করবে না? দাও তবে।

দুটো ব্লক ঘুরতেই গাড়ি শূন্য হয়ে গেল। একটা ঝিঙ্গে কিংবা একটি বরবটি পর্যন্ত পড়ে থাকল না।

কিন্তু ওয়েস্ট রোড কিংবা সার্কল রোডের হেনা, পারুল, স্বরূপা কাউকে হতাশ করল না মনমোহন। বললে, 'প্রথম দিন ঠিক বুঝতে পারি নি কতোটা জিনিস কাটবে। বিকেলে আমি আবার আসব। তখন অবশ্য শুধু ভেজিটেবল পাবেন, মাছ কেবল সকালে।'

সুনীলা শুধল, 'তুমি কি রোজ আসবে?' 'আজ্ঞে—হ্যাঁ।' মনমোহন হেসে মাথা নাড়ল, 'সকালে আসব, আবার বিকেলেও আসব। অনেক ধরে কয়ে ভেণ্ডারের লাইসেন্স নিয়েছি ফ্যাক্টরী থেকে। একটিও মন্দ জিনিস, পচা কি বাসি জিনিস পাবেন না দিদি আমার কাছে। পেলে লাইসেন্স কেড়ে নেবে, ক্রিসেণ্ট্ কলোনী থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।'

সুনীলা ভুরুর ঘাম মুছল আলতো করে। 'নাকি, তা বেশ, খুবই ভাল ব্যবস্থা। আমার জন্যে বিকেলে কিছু শাকসব্জি এনে দিও। অর্ডার দিয়ে রাখলুম।'

মনমোহন সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করে নাম কোয়ার্টার নম্বর সমেত শাকসব্জির অর্ডারটা টুকে নিল।

সুনীলার দেখাদেখি মিসেস্ চক্রবর্তী অর্ডার দিয়ে দিলেন। লতিকা, আরতিরাও।

শরতের ঝকঝকে রোদ তেতে উঠতেই মনমোহন তার অদ্ভুত পাঁচ চাকার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ক্রিসেণ্ট্ কলোনীর ঘরে ঘরে আর একদফা বিস্ময় আর কৌতুক জাগিয়ে দমকা হাওয়ার মত চলে গেল।

জামরুল গাছের ছায়ায় সিমেন্টের বেঞ্চে লিলি, মাধবী আর আভা বসেছিল। শরতের রোদ পড়ে সামনের দুর্বাদল সবুজে সোনায় ঝিকমিক করছিল। ভেলভেট পোকা চোখে পড়ছিল একটি দুটি।

গায়ের আঁচলটা কাঁধে টেনে তুলতে তুলতে লিলি বলল, 'ভেণ্ডারটার ওই কাঁচের গাড়ি তো দুদিনে ভাঙবে! এতোখানি রাস্তা যাওয়া আসা কি ওই হালকা কাঁচের গাড়িতে পোষায়!'

মাধবী বলল, 'গাড়ি দেখিয়েই লোকটা গলা কাটবে। ক্রিসেন্ট্ কলোনীতে ও টাকা সের আলু বেচবে—চার টাকা করে মাছ। বাব্বা!'

আভা হাসল না। অনেকক্ষণ থেকে কি যেন ভাবছিল। বললে, 'এই ছোকরাকে ভাই আমি কোথায় যেন দেখিছি। খুব চেনা চেনা মনে হল!'

লিলি খিল খিল করে হেসে উঠল। আভার কাঁধে চিমটি কেটে বললে, 'একটু যদি দেখতে সুন্দর হল—আর কি, তোর অমনি চেনাচেনা লাগে।'

মাধবী পায়ের চটিটা বুড়ো আঙুলের ডগা করে ঘাসে ছুঁড়ে দিল। হাসতে হাসতে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কি নাম যেন রে লোকটার?'

'মনমোহন—!' লিলি আবার হাসল, বিনুনীটা বুকের দিকে টানা ছিল, হাসিতে কেঁপে উঠল, 'মনমোহনই বটে। আভার মন তো এক নজরেই—'

'আ—,' আভা বিরক্তির একটা ভঙ্গি করলে, 'কি যা তা ইয়ার্কি করিস তুই। কোথাকার একটা ভেণ্ডার!'

লিলি আর হাসল না। মাধবী আড়-চোখে আভার মুখটা নজর করল। আর আভা ছাপানো শাড়ির আঁচলের একটা ফুল মুঠোয় ধরে উঠে দাঁড়াল।

প্রথম সপ্তাহটা বুঝতে সময় নিল। তারপর ভেণ্ডার মনমোহন ক্রিসেন্ট্ কলোনীর ধাত ধরে ফেলল। এখন আর তার গাড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার দরকার হয় না কারুর।

সকালে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে তার অটো-বাইক-ফিট করা গাড়িটা ক্রিসেন্ট্ কলোনীর মধ্যে বার কয়েক হর্ণ দিয়ে ঢুকে পড়ল প্রথমেই নর্থ ব্লকে। মিসেস্ নাগের কোয়ার্টারে গাড়ি দাঁড়াল। মিসেস্ নাগ বেরিয়ে আসুন না-আসুন মনমোহন জানে এ বাড়িতে কি কি লাগবে, লাগতে পারে। মনমোহনের নিজের কতকগুলো নিয়ম আছে। খুব সহজ পরিচ্ছন্ন গলায় এবং হাসি হাসি মুখে এই নিয়মগুলো সে ক্রিসেন্ট্ কলোনীর গৃহিনীদের জানিয়ে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মাছের বেলায় শুধু নয়, শাকসব্জির বেলায়ও এক পোয়ার কম কোনো জিনিস সে বিক্রি করবে না, করতে পারে না, তাতে অসুবিধে, উভয় পক্ষেরই। বুঝলেন না, অল্প নিলে এ-বেলার জিনিস ওবেলা ফুরোবে, না হয় কাল সকালেই—তখন আবার চাইবেন আপনি, অথচ আমার খদ্দের সকলেই, এ গাড়িতে আর কতো মাল ধরে, আপনাকেই যদি এবেলা ওবেলা টুক টুক জিনিস দি—অন্যকে কি দেব! তার চেয়ে এ বেলা কিংবা একদিন চলে এমনভাবে আপনি নিন ; ও বেলা আমি অন্যকে এনে দেব।

মনমোহনের এই নিয়মটার যেমন কমের মাপ নির্দিষ্ট আছে—তেমনি আবার উল্টোটাও। এক সেরের বেশি কেউ কিছু পাবে না। এখানেও মনমোহন তার যুক্তি দিয়ে সকলকে বুঝিয়েছে। একা আপনিই যদি সব নিয়ে নেন তবে অন্যে কি নেবে! ব্যস্ত হবার কি আছে দিদিমনি। আমি তো আছি। দু-বেলা আসছি। দরকার লাগে স্পেশ্যাল অর্ডার দিন ওবেলা পৌঁছে দিয়ে যাব।

ভেণ্ডার মনমোহনের এই মাপজোপকে লিলিরা ঠাট্টা করে বলে,

এতোকাল মেট্রিক সিস্টেম শুনেছি—এ হ'ল মনোমোহন সিস্টেম। কি সাংঘাতিক গলাকাটা রে বাবা, কম বেশী এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যে দুদিকেই লাভ।

মেয়েরা যাই বলুক মায়েদের মাথায় অত হিসেব ভাল করে ঢোকে না। ঢুকলেই বা কি! অন্য উপায় তো নেই। এ তবু ঘরে বসে খুসিমতন টাট্‌কা জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে। দাম একটু বেশিই পড়ে হয়ত, কিন্তু লোক পাঠিয়ে শহর থেকে বাজার করে আনতে এর চেয়ে কি-ই বা কম পড়ত। তার চেয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে—যেমন-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে—তাই ভাল।

মনমোহনও যেন সাত দিনে ক্রিসেণ্ট্‌ কলোনীর গৃহিণীদের মনের কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছে। গাড়ি নিয়ে এল, অত্যন্ত দ্রুত হাতে এবং দক্ষতার সঙ্গে কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে জিনিস নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলতেও হয় না, মনমোহন জানে—মিসেস্‌ নাগের টম্যাটো লাগে রোজ, মিসেস্‌ রায় বীট গাজরটা একদিন অন্তর নেন, মিসেস্‌ চ্যাটার্জীর শাকপাতা কিছু চাই-ই! কে কি ভালবাসে, কে কি নেবে, নিতে পারে—মনমোহন সব জেনে ফেলেছে।

মনমোহনের আরও দুটি সদ্‌গুণ আছে। তার কাছে সবাই সমান। আজ যদি সকালে গাড়ি নিয়ে নর্থ ব্লক থেকে বিক্রি সুরু করল, বিকেলে সুরু করবে সাউথ ব্লক থেকে। এবং আগামীকাল মনমোহনের গাড়ি প্রথমে এসে থামবে ওয়েস্ট রোডের ব্লকে। সবাইকে ও সমান সুবিধে দেবে, সমান চোখে দেখবে।

এ-ছাড়া লোকটার আর একটা বড় গুণ—পয়সার জন্যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে দিলে তো দিলে, না দিলে মনমোহনের ছাপানো স্লিপে দামটা লিখে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সপ্তাহান্তে কি মাসান্তে দাও যেমন তোমার খুসি।

আস্তে আস্তে আরও একটা গুণের কথা জানা গেল। সেটা জানল মেয়েরা প্রথমে।

পার্কের গা-লাগানো রাস্তা দিয়ে লিলি, মাধবী, আভা সকালের রোদে পা মিলিয়ে যাচ্ছিল করুণার বাড়ি। ক্রিসেণ্ট কলোনীতে শারদোৎসবের একটা আয়োজন চলছে। মেয়েরাই করছে সব। করুণা পালিত তার নেত্রী।

লিলিরা আপন মনে গল্প করতে করতে চলেছিল। হঠাৎ হর্ণ শুনে রাস্তার পাশে ঘাসে নেমে গেল।

মনমোহন তার গাড়ি চালিয়ে আসছে। মাথায় সোলার হ্যাট। সেই খদ্দরের চেক-কাটা সার্ট, পাজামা।

মনমোহন কাছাকাছি এসে লিলিদের দেখতে পেয়ে একটু যেন হাসল। হাসিটা সৌজন্যের।

ক্রিসেণ্ট কলোনীর নিরিবিলি প্রায়নিস্তব্ধ রাস্তায় মৃদু একটানা ভট্ ভট্ শব্দ উঠছিল গাড়িটার। দেবদারুর ছায়া পেরিয়ে গাড়িটা যখন নাগালে এসে গেছে লিলি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। হাত উঠিয়ে ইসারায় গাড়িটা থামাতে বললে।

মনমোহন ব্রেক কষলো। মাটিতে পা নামিয়ে স্টিয়ারিং ধরে সিটে বসে বসে ঘাড় ঘোরাল। ঠোঁটের গোড়ায় সেই পুরনো হাসি। চোখের দৃষ্টিতে শুধু একটা প্রশ্ন।

লিলি বোধ হয় কোনো কিছু ভাল করে ভাবেনি গাড়ি থামাবার আগে। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ল। মাধবী আর আভা একবার মনমোহনের আর একবার লিলির মুখের দিকে চেয়ে অপলক হয়ে থাকল।

লিলি মিত্র যতই হোক—সেণ্ট পেট্রিকে পড়েছে সে-দিন পর্যন্ত, স্মার্ট হতে দু-দণ্ডও লাগে না। লম্বা ঢঙের ফরসা গালে চট করে একবার আঙ্গুল ছুঁইয়ে কি যেন বলি বলি কথাটা মনে করে নিয়ে

বলল, 'তোমাকে বলব ভাবছিলাম। আজ বিকেলে তো আবার আসবে তুমি। কিছু ফুল এনে দিতে পার টাউন থেকে? বড্ড দরকার।'

মাধবী আর আভা লিলির জ্বলজ্বলে চোখ দেখছিল। ভুরুর সরু টানে কতখানি আভিজাত্য ফুটেছে যেন তাও লক্ষ্য করছিল।

মনমোহন, আশ্চর্য বলতে হবে এই ভেণ্ডার মনমোহনকে—এ সময়ও সে চট করে তার পকেট থেকে অর্ডার লেখা খাতাখানা বের করতে দ্বিধা বা বিলম্ব করলে না। কি কি ফুল চাই আপনার?

লিলি চট করে ফুলের নাম বলতে পারল না। এখন কি কি ফুল পাওয়া যায়, কোন্ কোন্ ফুলের সময় এটা—লিলির কিছুতেই মনে পড়ল না। হয়ত সে অতো জানেও না।

'যা যা পাওয়া যায় বাজারে।' লিলি একটু অস্বস্তি বোধ করে তাড়াতাড়ি কথাটা মিটিয়ে দিতে চাইল।

'বাজারে—এখানকার টাউনের বাজারে কলকাতার মতন ফুল বিক্রি হয় না।' মনমোহন যেন ছোট ছেলেমেয়েকে বোঝাচ্ছে এমন সুরে কথাগুলো বললে, এবং হাসি হাসি মুখেই।

লিলি ভেণ্ডার মনমোহনের মুখের দিকে চাইল। চোখে সামান্য বিরক্তি। 'তবে তুমি যে অর্ডার নিতে যাচ্ছ তাড়াতাড়ি?'

'বাজারে না পাওয়া যাক্ আমি এনে দেব যোগাড় করে।' মনমোহন বলল। খাতাটা পকেটে পুরে ফেলে একবার গিয়ারটার দিকে চাইল। মুখ তুলে আবার শুধল, 'ক' টাকার ফুল নেবেন?'

হঠাৎ যেন নিজেকে খুব অসহায় এবং অপমানিত বোধ করলে লিলি। পলকের জন্যে মনমোহনের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বললে, 'এনো কিছু। দু চার টাকার যা যোগাড় করতে পার।'

মনমোহন আর কোন প্রশ্ন করল না। গাড়ি নিয়ে চলে গেল। একটুও ধোঁয়া উঠল না, ধুলো উড়ল না।

তবু নাকে আলগা করে আঁচলের কোণটা চাপা দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'ইডিয়েট!'

রাস্তায় উঠেছিল মাধবী, আভা। হাঁটতে হাঁটতে মাধবী বললে, 'হঠাৎ তোর ফুল দরকার হল কেন?'

লিলির মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল সামান্য। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। খানিকটা পরে বললে, 'কেন আবার, এমনি। হঠাৎ মনে হল। খেয়াল। ভাবছিলাম ফুলটুল পরে আজ সন্ধ্যেবেলায় নাচটা একবার রিহার্সাল দিয়ে নেব।'

মাধবী আর আভা লিলিকে শুধু একবার দেখে নিল। কিছু বললে না।

খানিকটা হেঁটে আসতে আসতে লিলির মেজাজ বোধ হয় নরম হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বললে আভাকে, 'কি রে—তুই মনে করতে পারলি!'

'কি?' আভা অবাক।

'আমাদের এই ভেণ্ডারটাকে কোথায় যেন দেখেছিস বলছিলি যে সেদিন।'

আভা মাথা নাড়ল। ক'দিন ধরে আভা মনমোহনকে দেখেছে আর ভেবেছে। আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকটাকে আচমকা মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, এ নিঃসন্দেহেই সেই লোকটা যে গত বছর আভাদের কলেজ ফাংসানে কাঁচের গেলাসের মধ্যে মাউথ অর্গান বাজিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

কথাটা আভা বলে ফেলল।

মাধবী বিশ্বাস করতে পারছিল না। বললে, 'যা, কাকে ভাবতে কাকে ভাবছিস! এ লোকটা ওসব বিদ্যে কোথ্‌ থেকে জানবে।'

আভার তবু দৃঢ় প্রত্যয়। এ না হয়ে যায় না।

লিলি বললে, 'কথা কাটাকাটি রাখ তোরা। মাউথ অর্গান

আবার বাজনা নাকি, ও তো পানবালা বিড়িবালারা বাজায়। এই ভেণ্ডারটাই না হয় বাজিয়েছে। কি মাথা কেনা গেছে তাতে!'

কথাটা আভার কানে ভাল শোনাল না। তবু আর কথা বললে না আভা।

বিকেলে লিলির ফুল সত্যি সত্যিই এল। আর শুধু কি ফুল— ভেণ্ডার মনমোহনের রুচি এবং চোখ যে এত ভাল কে জানত। রজনীগন্ধার সঙ্গে শিউলি, কাঠ মালতীর সঙ্গে জবা যেন মিশেল দিয়ে নিয়ে এসেছে। আর কিছু বকুল।

লিলিদের কোয়ার্টারে এসে ফুলের টুকরিটা নামিয়ে দিল মনমোহন। লিলির মা প্রতিভা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি প্রথমে। কার ফুল, কিসের ফুল? ও, লিলি অর্ডার দিয়েছিল! জানতুম না। কতো দাম? তিন টাকা? তিন টাকার ফুল—!

লিলি বাথরুম থেকে সদ্য বেরিয়েছিল। গায়ে মুখে সাবানের গন্ধ, জলের কণা, ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে মুখ চোখ। সান্ধ্য-সজ্জা সারেনি তখনও। মার ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসে ফুলের টুকরি উঠিয়ে নিল।

প্রতিভা যেতে যেতে মেয়েকে বললেন, 'টাকাটা দিয়ে দাও।'

লিলির চিবুকে রজনীগন্ধার নরম সাদা ছোঁয়া লাগছিল। শিরশির করছিল গা—স্পর্শে আর গন্ধে।

'কতো দাম?' লিলি বুকের কাছ থেকে টুকরিটা একটু নামিয়ে নিয়ে শুধলো।

'তিন টাকা!'

'তি—ন টাকা! এই ক'টি ফুলের?'

'এ তো সস্তাই!'

'সস্তা—!' লিলি ভিজে ভিজে চোখে ভৎ'সনা করলে যেন,

'তোমার কাছে তো সবই সস্তা।' আর কথাটা শেষ করে লিলি একটু হাসল। 'দাঁড়াও দামটা নিয়ে যাও।'

ফিরে এসে লিলি তিনটে টাকা দিয়ে বললে, 'তুমি নাকি মাউথ-অর্গান বাজাতে পার?'

মনমোহন তেমনি হাসি হাসি মাথা নাড়ল। 'পারি, অল্পস্বল্প।'

লিলির চোখে প্রশংসা ঝরল না। বরং খুটিয়ে পরীক্ষা করার মতন দৃষ্টি। 'আর কি পার—!'

'হকি খেলতে।' মনমোহন সরলভাবে জবাব দিল।

মনমোহনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে লিলি ঠোঁট কামড়াল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে কোয়ার্টারের সামনের মোরম ঢালা পথটুকু মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরে গেল।

লিলি ফুলের অর্ডার দিয়েছিল। ফুল পেয়ে খোঁপায় গুঁজল। গলায় মালা করে পরল। বাহুতে আর মণিবন্ধে। সত্যিই এই ফুলসাজ পরে শারদোৎসবের নাচটার রিহার্সাল দিল লিলি সন্ধ্যে-বেলায়। আলোয়। করুণা পালিতের ড্রয়িংরুমে।

মাধবী বললে, 'ভেণ্ডারটাকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে দিস। সত্যি, ফুলগুলো কী টাট্‌কা আর সুন্দর।'

লিলি আলো থেকে একটু আড়ালে, বারান্দায় আধো অন্ধকারে সরে এসে নাচের ক্লান্তি আর স্বেদ জুড়িয়ে নিচ্ছিল। বেশ বাস একটু শিথিল।

আভা একটু অন্য রকম হেসে বললে, 'তোকে পরাবার জন্যে বেছে বেছে এনেছে বোধ হয়। চোখ আছে মানুষটার।'

লিলির নিজেরই খুব ভাল লাগছিল। মনটা নরম আর লঘু ছিল। অল্প একটু বিহ্বলও বোধ হয় হয়েছিল। তরল সুরে বললে, 'আমি ভাবছি, করুণাদিকে বলব—শারদোৎসবের দিন ফুলটুল যা লাগবে আমাদের ওকে অর্ডার দিয়ে দিতে। ও পারবে। লোকটা কাজের।'

মাধবীর কি মনে হয়েছিল, আচমকা শুধল, 'ফুলের কতো দাম নিল রে ?'

প্রশ্নটা লিলির কানে, এই সময়—বারান্দার এই আধো অন্ধকারে ভাল লাগল না। করুণাদির ড্রয়িংরুমে তখনো অর্গান বাজছে। ছোট ছোট মেয়েদের নূপুরের শব্দ। রিহার্সাল চলছে ভেতরে। কি তার মনে হ'ল, বললে, 'দাম নেয় নি।' বলে হাসল, হেসে ঘাড় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে চাইল।

'দাম নিল না ?' মাধবী অবাক।

'না। দিতে গেলাম, হাত গুটিয়ে নিল।' লিলি অক্লেশে বলে চলল, তরল গলায়, 'কিছুতেই নিল না। বললে, এ-ফুলের আবার দাম কি ! আপনি বলেছিলেন, যোগাড় করে নিয়ে এলাম।'

মাধবী লিলির মুখ এবং চোখ ভাল করে নজর করবার চেষ্টা করছিল। পারছিল না।

লিলি নিজেই বললে একটু থেমে, 'লোকটা সত্যিই অদ্ভুত। ফুলের যেন দাম হয় না। যেন আমায় ফুল এনে দিতে পেরেছে এতেই সে খুশী।' লিলি গা দুলিয়ে নড়ে উঠল কথাটা শেষ করে—আর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল।

শারদোৎসবের ফুলের অর্ডারটা মনমোহনকে সত্যিই পাইয়ে দিয়েছিল লিলি। নিজেই গরজ করে, গোঁ ধরে। এমন কিছু পঞ্চাশ কি শ' টাকার অর্ডার নয়, করুণাদিও না-না করেছিলেন—কিন্তু লিলি শুনল না। কে কখন টাউনে যাবে, দরকারের সময় তখন একটা মালার জন্যে ছুটোছুটি, শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা কাগজের মালা গলায় ঝুলিয়ে ষ্টেজে নামতে হবে। দরকার কি এ সবের ? কার বাগানে ফুল আছে, দেবে কি না-দেবে, দিলেও কৃপণ হাতে, পাঁচবার

না-না করে। তার চেয়ে দশ পনেরো টাকার ফুল আনতে বলে দিলেই হল ভেণ্ডারটাকে।

তা মনমোহন বেশ ভাল ফুলই যোগাড় করে এনে দিয়েছিল।

পরের দিনই দেখা। সেই তিন বন্ধু—লিলি, মাধবী আর আভা বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের উৎসবের গুণগান শুনে বেড়াচ্ছিল। ওয়েষ্ট রোড দিয়ে যাবার সময় মনমোহনের সঙ্গে দেখা।

আজ আর লিলি নয়, মাধবীই দাঁড়াতে বললে হাত তুলে। মনমোহনের গাড়ি দাঁড়াল। ষ্টার্ট বন্ধ হল না। ভট ভট শব্দটা ওয়েষ্ট রোডের নির্জনতায় বেশ লাগছিল।

রাস্তার ধার থেকে একটু এগিয়ে মাধবী মনমোহনের প্রায় 'কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

লিলি আর আভা দেখছিল।

'কই কি হল?' মাধবী বলছিল মনমোহনকে, 'লিলি আভা শুনতে পাচ্ছিল স্পষ্ট, 'আমার যে তাড়াতাড়ি দরকার।'

'কালই এনে দেব। যদি চান আজ বিকেলেও দিয়ে যেতে পারি।' মনমোহন হাসছিল। তার সেই পুরনো চেনা হাসি।

'আজকেই বিকেলে জিনিসটা চাই তা হলে।' মাধবীর গলায় মধুর সুর। একটু বোধ হয় দাবী, ঈষৎ অভিযোগও থাকতে পারে।

'বেশ—, তাই হবে।' মাথা নাড়ল মনমোহন, 'আজ বিকেলেই পৌঁছে দেব।'

মনমোহনের গাড়ি চলে গেল।

লিলি শুধলো, 'কি রে—কি জিনিস?'

'কিছু না তেমন।' হাঁটতে হাঁটতে হাল্‌কা গলায় মাধবী জবাব দিল, 'একটা ফটোফ্রেম।'

'ভেণ্ডারটাকে তুই ফ্রেমের কথা বলেছিস?' লিলি কৌতূহল বোধ করছিল।

'আমি নিজের থেকে কি কিছু বলেছি'—মাধবী গায়ের আঁচলের খানিকটা গলায় জড়িয়ে আবার খুলছিল। কারুর দিকে তাকাচ্ছিল না। দৃষ্টিটা সামনে। একটু থেমে বলল, 'কি কথায় যেন সেদিন ওকে জিজ্ঞেস করছিল মা, টাউনে ফটোটটো বাঁধাবার ভালো দোকান আছে কি না—তা ও নিজেই—জানিসই তো কী ভীষণ টকেটিভ আর উৎসাহ লোকটার—হ্যাঁ, নিজেই ও—কি ছবি, কতো বড় ছবি, কার ছবি বাঁধাতে হবে—এই সব বলে মার কাছ থেকে আমার ফটোটাই নিয়ে গেল।' মাধবী কথাটা শেষ করে এমনভাবে বন্ধুদের দিকে তাকাল আর মুখ চোখ কোঁচকাল, যেন মনমোহন ভেণ্ডার তার ছবি নিয়েছে এটা মাধবীর মোটেই পছন্দ নয়। একটু থেমে আবার বললে মাধবী, 'দিন পাঁচেক হয়ে গেল ভাই—সেই ছবি, মানে আমার ফটোটা—অমন সুন্দর ফটোটা ফেরৎ পাচ্ছি না।'

মাধবী চলতে চলতে ঘাড়ের কাছে খোঁপাটা খুলে দিল।

'ভেজিটেবল বিক্রি করা ভেণ্ডার কি ফটোও বাঁধায় নাকি?' লিলি বেঁকা সুরে প্রশ্ন করল। যেন এটা তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'কে জানে।' মাধবী বলল, 'বাঁধানোর আর কি আছে। দেওয়ালে ঝুলানোর জন্যে তো নয়, টেবিলে কিংবা ফায়ার প্লেসের ওপরে রাখব আমি। ওকে ষ্ট্যাণ্ডের কথাই বলা হয়েছে।'

একটা মোড় ঘুরে লিলিরা কেতকী মাসীদের কোয়ার্টারের মুখোমুখি হল।

আভা এতক্ষণ মাধবীদের কথা শুনছিল—কিছু বলেনি। এবার বললে, উপহাস অথবা ঠাট্টা ঠিক যে কোন্ গলায় তা বোঝা গেল না, 'তোর বোধ হয় ঘুম হচ্ছে না।'

'এক রকম তাই।' মাধবী আভার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্ত হবার ভঙ্গি করলে মুখের আবেভাবে, 'কোথাকার একটা রাস্তার

লোক আমার ফটো নিয়ে সাতদিন ধরে আটকে রাখবে! কি বিশ্রী কাণ্ড! আমার ভাই সত্যি এসব পছন্দ হয় না।'

'আহা, তোমার না হয় তার তো হয়—যে আগলে রাখে।' লিলি হাসল, 'বেচারী দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে!'

লিলির কথায় আভাও ঠোঁটের গোড়ায় খানিকটা না হেসে পারল না।

মাধবী লিলির বিনুনী ধরে আস্তে একটু টান দিয়ে থমকে দাঁড়াল এবং ভ্রূকুটি করে বললে, 'বড্ড অসভ্য তুই! কোথাকার ষ্ট্রীট ভেণ্ডার তার সঙ্গে'—মাধবী কথাটা আর শেষ করল না।

কেতকী মাসীর কোয়ার্টারের সামনে এসে পড়েছিল ওরা। ওদের দেখে কেতকী মাসীর বারান্দায় ঝুলনো খাঁচাতে ময়নাটা ডেকে উঠল।

তিন বন্ধুই তাকাল। এবং ময়নাটাকে দেখতে গিয়ে তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

ব্রাউন পেপারে সুন্দর করে মুড়ে টোয়াইন সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল। মাধবীর হাতে দিয়ে মনমোহন বললে, 'দেখে নিন পছন্দ হয় কি না!'

এখানে আর কেউ ছিল না। মাধবীদের কোয়ার্টারের সামনে, শিশুগাছের তলায় শেষ বিকেলের ছায়াটা ঘন হচ্ছিল। এবং ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছিল, পাখি ডাকছিল।

মাধবী টোয়াইন সুতোর গিট ছাড়িয়ে ব্রাউন পেপারের মোড়কটা খুলে ফেলল।

এতোটা আশা করার কোনো কারণ ছিল না। মাধবী খানিকক্ষণ আর চোখ তুলতে পারল না। ভেণ্ডার মনমোহন বাস্তবিকই অবাক করতে পারে।

নিকেল করা কিংবা জার্মান সিলভারের নামে বাজারে চলতি চক্‌চকে ফটো ষ্ট্যাণ্ডগুলোই মাধবী আশা করেছিল। মনমোহন সে পথে যায় নি। পাতলা কাঠের কাজ করা ফ্রেমের মধ্যে ছবিটা বাঁধিয়ে এনেছে। অবশ্য এটাও ফটো ষ্ট্যাণ্ড। সামান্য বোধ হয় কারিকুরী করতে হয়েছে।

মাধবী কাঠের সেই সুন্দর লতানো কাজগুলো দেখে খুসীভরা চোখ তুলে চাইল। 'টাউনে এসব জিনিস পাওয়া যায়।'

'সহজে যায় না, একটু লেগে থাকতে হয়, খানিকটা মাথা খাটাতে হয়।' মনমোহন হাসল, বিনীত হাসি, 'আপনার তা হ'লে পছন্দ হয়েছে?'

'খু—ব!' মাধবী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইছিল। 'আমি তো ভাবিই নি এখানে এসব পাওয়া যেতে পারে।'

'পাওয়া কঠিন। কিন্তু কঠিন বলে কি আর আপনারা ছাড়বেন। তাও তো মাত্র পরশু ফটোটা দিয়ে তাড়াহুড়ো সুরু করলেন। নয়ত এর চেয়েও ভাল জিনিস হত।' মনমোহন হাসল, 'ফটোটার কোনো দরকারই ছিল না—সাইজটা আমি জানি। কাউকে বলে কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতাম।'

'ফটোটা না দিলে সাইজে গোলমাল হতে পারত।' মাধবী কেমন একটু জোর করে বললে।

'আপনি তো দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমি—আমার কি দুশ্চিন্তা। আমাদের কি আর রাখবার জায়গা টায়গা আছে, কোথায় হারাব—জলে ভিজবে, ময়লা লাগবে, কুঁচকে টুঁচকে যাবে।' মনমোহন যে এই দুশ্চিন্তা এবং দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নামাতে পেরেছে তার জন্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

মাধবীর মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছিল। যেন এখন আর

আগের মতন খুশী হতে পাচ্ছে না। অস্ফুট স্বরে বলল, 'একটা ছবি রাখতে এতো দুশ্চিন্তা!'

মনমোহন আর সে-কথার জবাব দিল না। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল, 'রসিদ।'

রসিদটা মাধবী নিল না। বললে, 'থাক্—রসিদ আমার দরকার নেই। কতো লাগবে বলো।' একটু থামল, এ-পাশ ও পাশ তাকাল অস্বস্তি এবং বিরক্ত বিরক্ত হয়ে। 'টাকাটা আমিই তোমায় দু চার দিন পরে দিয়ে দেব। আমিই দেব, বুঝলে, মার কাছে যেন চেয়ো না।'

মনমোহন রসিদটা পকেটে রেখে দিল। হাসল আগের মতনই মিষ্টি মিষ্টি, বলল, 'ঠিক আছে। পরেই দিয়ে দেবেন। সাড়ে পাঁচটা তো টাকা মাত্র!'

মনমোহন তার গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে যাচ্ছে মাধবী হঠাৎ বললে, কোন কিছু না ভেবেই, আচমকা একটা কথা ঠোঁটে এসে গিয়েছিল বলেই যেন, 'এর চেয়েও ভাল জিনিস পাওয়া যেত তুমি বলছিলে!'

মনমোহন মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ, যেত।'

মাধবী একটু ভাবল। দোনামোনা ভাব, অন্যমনস্ক। হঠাৎ ব্যাপারটার যেন নিষ্পত্তি করে ফেলে মৃদু হাসল, 'যাকগে, এই বা মন্দ কি! তুমি কি বলো?'

'আমি আর কি বলবো, আপনার যখন পছন্দ হয়েছে—' মনমোহন হাসি হাসি মুখে বলল।

'না-না; তবুও। তোমার তো একটা চোখ আছে।' মাধবী কিসের এক প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল।

'আমাদের আবার চোখ—।' মনমোহন হাসিটা আরও স্পষ্ট করে তুলল, 'আমাদের চোখ নিয়ে কি হবে! কাষ্টমারের চোখই সব, বুঝলেন না। আপনার কি ভাল লাগল তাতেই আমার দুটো

টাকা আসবে। আমার ভালমন্দ লাগায় কিছু না, একটা পয়সাও আসবে না পকেটে।' একটু থামল মনোমোহন, 'তা আপনার জিনিসটা ভালই হয়েছে—বেশ মজবুতও।'

মাধবী আর কিছু বলল না। ভীষণ হতাশ আর স্তব্ধ দেখাচ্ছিল তাকে।

গাড়িটা আর রুখল না মনমোহন। বিকেল পড়ে যাচ্ছিল, এখনও অনেকগুলো কোয়ার্টার তাকে ঘুরতে হবে।

লতাপাতার কাজ করা ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটা হাতে করে মাধবী দাঁড়িয়ে থাকল। কোনো আর উৎসাহ পাচ্ছিল না।

কথাটা লিলিই পরের দিন খুঁচিয়ে তুলল। 'কি রে, তোর ফটো ফেরৎ পেলি?'

মাধবী মাথা নাড়ল। পেয়েছি। বললে, 'যাই বল ভেণ্ডারটার টেষ্ট আছে। খুঁজে টুঁজে যোগাড় করেছে ঠিক। জিনিসটা সত্যি চমৎকার। দেখলে মনে হয় কাশ্মীরী। এমন সুন্দর জিনিস ও যোগাড় করতে পারবে আমি ভাবি নি।'

'তোর মুখের সঙ্গে মানিয়ে দিয়েছে আর কি।' লিলি ঠোঁট গাল কুঁচকে হাসল। 'কতো পড়ল?' আভা জানতে চাইল।

আভার দিকে চাইল মাধবী। তারপর লিলির দিকে। অস্বস্তির সুরে বললে, 'কে জানে—, কিছুই বলল না। ভেণ্ডারটার বিহেভিয়ার আমার একদম ভালো লাগে না। বার বার জিজ্ঞেস করলাম, কত পড়েছে, কি দাম—লোকটা গ্রাহ্যই করলে না। হে হে করে হাসল, পরে হবে পরে হবে করে ক'বার মাথা দোলালো, ব্যাস হয়ে গেল।' মাধবী চোখের ভুরু কপাল কুঁচকে মুখটা বিরক্তিতে বিশ্রী করে তুলল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা সুবিধের নয়। ওর মতলব টতলব ভাল না।'

লিলি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাধবীর মুখ দেখছিল। আর আভা অপলক চোখে বন্ধুর দিকে চেয়েছিল।

সুযোগটা আভা অনেকদিন থেকেই খুঁজছিল। পাচ্ছিল না। আজ পেয়ে গেল। মনমোহনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল, ক্রিসেন্ট কলোনীর বাইরে। জি টি রোডের ওপর। আভা দাঁড়িয়েছিল। এক হাতে তার ছাতা, অন্য হাতে কাপড়ে ঢাকা সেতার। সেতারটা বুকের কাছাকাছি ধরে রাস্তার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল।

ক্রিসেন্ট কলোনীর গেট ছাড়িয়ে জি টি রোডে উঠতেই আভাকে দেখল মনমোহন। কাছে এসে গাড়িটা থামাল। সৌজন্যের হাসি হাসল। 'টাউনে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?'

মাথা নাড়ল আভা। হ্যাঁ, টাউনে যাবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফিতের মতন ছড়ান রাস্তাটার দিকে চাইল মনমোহন। 'বাসের তো দেখা নেই!'

'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি! পা ধরে গেল।' অপ্রসন্ন মুখে বলল আভা।

'আজ হয়তো বাস নাও পেতে পারেন। কাল একটা গণ্ডগোল হয়েছে—এই বাস সার্ভিস নিয়ে। মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত বাস চালাবে না ওরা।'

'না কি!' আভা অবাক এবং চিন্তিত হল, 'জানতাম না তো, শুনিনি। তাই, আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও একটা বাস আসতে যেতে দেখলাম না।' আভা যেন ততক্ষণে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে। 'কি হয়েছিল?'

'জানিনা ঠিক। শুনলাম, নিয়ামাতপুরের কাছে অ্যাকসিডেন্ট করেছিল একটা বাস। ড্রাইভারটাকে সবাই মিলে এমন মেরেছে যে লোকটা মর মর। অনেকে বলছে মরেই গেছে। তাই নিয়ে গণ্ডগোল।'

আভা মনমোহনের মুখের দিকে চেয়ে সব শুনল। তারপর কী ভাবল! ইতস্তত করল একটু। বললে, 'তা হলে আর কি হবে—ফিরে যাই। অযথা খানিকটা দুর্ভোগ ভুগলাম।'

মনমোহন হাসল। অর্থাৎ কথাটায় সায় দিল। 'আর ওই যা একটা গাড়ি—' আভা মনমোহনের গাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে হাসল, 'ওতে চেপেও যে যাব তার উপায় নেই। আমায় তা হ'লে দমবন্ধ করে কাঁচের ঢাকনার মধ্যে পুতুল হয়ে বসতে হবে। রাস্তায় মরে যাব।'

মনমোহন কিছু বলল না। শুধু হাসল। 'সেতারটা একটু বিগড়েছে।' আভা একটু পরে বলল, 'রোজই ভাবছি কাউকে দিয়ে মিউজিকাল ষ্টোরস্-এ পাঠিয়ে দেব। লোক পাচ্ছি না। আজ নিজেই যাচ্ছিলাম।'

মনমোহন তবু কিছু বলল না। আভা কিন্তু আশা করছিল কিছু বলবে মনমোহন।

আভা ভাবল। কথাটা কি নিজেই মুখ ফুটে ও বলবে। না। বলবে না। এতোতেও যখন লোকটা কিছু বলছে না—তখন নিজের থেকেও বলা ভাল দেখায় না।

আভা পারল না। বলেই ফেলল, 'এটা সারাবার একটা ব্যবস্থা করা যায়?' বলে মনমোহনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন, নয়—!' মনমোহন মাথা নাড়ল, 'আমায় দিতে পারেন!'

আভা সেতারটা বাড়িয়ে দিল। মনমোহন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। কাঁচের ডালাটা তুলল। সেতারটা রাখল আস্তে করে।

'দিন সাতেকের মধ্যে যেন পাই।' আভা বলল।

'সা-ত দিন, অতো দিন লাগবে না, আগেই পেয়ে যাবেন।' মনমোহন টুপিটা মাথায় ঠিক করে নিল।

'ডেলিভারী নেবার আগে একটু ভাল করে দেখে নিতে হবে।'

আভা মনমোহনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, একটু হাসল, 'সেটার ভার তোমার ওপর থাকল।'

'আমি?' মনমোহন বোকার মতন চাইল।

'তো কি, যে অত ভাল মাউথ অর্গান বাজায় তার কান, তার সুরজ্ঞান খানিকটা আছে, এ তো জানা কথাই—' আভা হাসছিল মুখ টিপে টিপে।

মনমোহন আভার দিকে চেয়ে একটু যেন কী ভাবল। বললে, 'বেশ। দেখে নেব, যখন বলছেন।' একটু থামল। তারপর আচমকা হাত বাড়াল, 'কতো নেবে তা তো বলতে পারছি না— গোটা দশেক টাকা আপাতত দিয়ে রাখুন।'

চমকে উঠল আভা। মনমোহনের দিকে চোখ তুলে আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল। মুখটা ক্রমশই লাল হয়ে উঠছিল। কপালের মধ্যে কেমন একটা দপদপে ভাব।

শুকনো ঠোঁটে, আমতা আমতা করে আভা বলল, 'টাকা কি আগে দিতে হয়? কই, জানতুম না! পরে—যা লাগে—'

'তাতে কি, ঠিক আছে—তাই দেবেন। আগেও যা, পরেও তাই।' ভেণ্ডার মনমোহন তার পুরনো সরল হাসি হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে বসল। ষ্টার্ট দিল। তারপর উধাও।

আভা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে! লিলি এবং মাধবীর কাছে কি বলবে সেটা মোটেই ভাবছিল না আভা। ভাবছিল, লোকটা—ভেণ্ডারই, তার বেশি কিছু নয়।

—০—

অমরেন্দ্র ঘোষ
কলেজ ষ্ট্রীটে অশ্রু ৪৷৷০
শক্তিপদ রাজগুরু
বনমাধবী ৩৷৷০
আশাপূর্ণা দেবী
অতিক্রান্ত ৫৷৷০
বেলা দেবী
জীবন তীর্থ ৫৲
বামাপদ ঘোষ
আমার পৃথিবী তুমি ৩৲
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
ছায়া-নট ২৷৷০
দীনেন্দ্রকুমার রায়
সানুকীতে বজ্রাঘাত ৩৲
ডাঃ মতিলাল দাস
মন্দার পর্ব্বত ৪৲
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
বাসরে মিলন ২।০
বুদ্ধদেব বসু
সূর্যমুখী ২।০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আকাশ কুসুম ২৷৷০
খরস্রোতা ৩৲
নারী জন্ম ৩৲
সতীকুমার নাগ
নূতন যুগের কাহিনী ১৷৷০
প্রশান্ত চৌধুরী
লাল পাথর ৩৲

উৎপলেন্দু সেন
বিজিতা ১৷৷০
অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ
শাশ্বতী ২৷৷০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
মরা মাটি ২৷৷০
দিনান্ত ৪৲
কর্ম্মৈদেবায় ৪৲
হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত
ধর্মানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র ২৲
সাহিত্য সাধক চিত্তরঞ্জন ২৲
বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত ৫৲
শশিভূষণ দাশগুপ্ত
সাহিত্যের স্বরূপ ২৷৷০
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
তরুণের স্বপ্ন ২৷৷০
নূতনের সন্ধান ২৲
লুই ফিশার
মহাজিজ্ঞাসা ১ম ৫৲ ২য় ৫৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্বদেশ ও সাহিত্য ২৷৷০
তরুণের বিদ্রোহ ৷৷০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঝাড়খণ্ডের ঋষি ৩৲
ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই ৩৲
স্বামি মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজ
কথার কথা ২৷৷০
পুরাণ কথা ১৷৷০